ইসলাম ও কাজী নজরুল

ইসলাম ও কম্মিউনিজ্‌ম্‌

গোলাম মোস্তফা

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

ষষ্ঠ প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫/জুন ১৯৮৮

মূল্য
পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ
মোস্তফা আজিজ

মুদ্রণ
মেছবাহ উদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

আমি অর্থনীতি বা রাজনীতির ছাত্র নই। ইউরোপে যতগুলি ism-এর সৃষ্টি হইয়াছে (যথা ঃ Capitalism, Socialism, Nazism, Fascism ইত্যাদি) সে সব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। ও-পথ আমার নয়। আশ্চর্যের বিষয়, তবু কিন্তু আমাকে কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বই লিখিতে হইল।

মুসলিম তরুণদের অনেকেই আজকাল কমিউনিজ্‌মের প্রতি বেশ খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইসলামী আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কমিউনিজ্‌মের রূপে ভুলিয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্ই হইল তাহাদের কাছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। যেন দুনিয়ায় এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না, নাই বা হইবে না। ইসলামের বিধান অপেক্ষা কমিউনিজ্‌মের বিধানই যে শ্রেষ্ঠতর এবং বর্তমান যুগসমস্যার সমাধানে এই ব্যবস্থাই যে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ইহাই তাহাদের ধারণা। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্যই আমার এই প্রয়াস।

একজন আনাড়ী লোকের কাছ হইতে পাঠক কিন্তু এ-বিষয়ে বড় কিছু আশা করিতে পারেন না। উপযুক্ত লোকের হাত হইতে এই বই বাহির হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কেহই যখন আসরে নামিলেন না, তখন অগত্যা আমাকেই নামিতে হইল।

কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে এ যাবত বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু ইসলামের দিক দিয়া এ-বিষয়ে কেহই তেমন কোন আলোকপাত করেন নাই। আমি সেই চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইলাম, পাঠকই তাহার বিচার করিবেন।

ভুল-ত্রুটি হয় ত অনেকেই ঘটিয়াছে ; কিন্তু বিজ্ঞ পাঠক তাহা গ্রহন করিবেন না, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, এ কাজের উপযুক্ত আমি নই।

বিনীত—
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ইসলাম ও কমিউনিজমের' প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। নানা কারণে এতদিন পুনর্মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সুধী-সমাজ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে যে সমাদর দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

অনেক বন্ধু-বান্ধব 'ইসলাম ও কমিউনিজমের' একটি উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে বহু নূতন তথ্য যোগ করা হইয়াছে। পূর্বে পুস্তকের কলেবর ছিল সাত ফর্মা, এখন তাহা বাড়িয়া এগারো ফর্মারও উপরে দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ৭০ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। কাজেই এবার বাধ্য হইয়া পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা স্থলে আড়াই টাকা রাখিতে হইল।

বিনীত—
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নানা কারণে এতদিন ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হয় নাই।

কমিউনিজ্‌মের ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; কারণ ইহার নীতি-পদ্ধতি ক্রমপরিবর্তনশীল। যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শাসনপদ্ধতি লইয়া ইহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আজ তাহা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও যে ইহার কোথায় কি পরিবর্তন ঘটিবে, বলা কঠিন। স্থিতিশীলতার প্রত্যয় যখন নাই, তখন পুস্তকখানি সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইল কমিউনিজ্‌মের সহিত ইসলামের সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। কাজেই, দ্বিতীয় সংস্করণের পর কমিউনিজমের ইতিহাসে অনেক কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গেলেও বর্তমান সংস্করণে সেই সব অসঙ্গতি দূর করার প্রয়াস আমরা করিলাম না। দ্বিতীয় সংস্করণে ঘটনা যেরূপ ছিল সেইরূপই রাখিয়া দিলাম। কাজেই এ সংস্করণকে কোন নূতন সংস্করণ না বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ বলিতে হইবে।

বিনীত—
গোলাম মোস্তফা

মোস্তফা মঞ্জিল
শান্তিনগর, ঢাকা
১লা আগষ্ট, ১৯৬৪

ইসলাম ও কমিউনিজ্‌ম্‌

প্রস্তাবনা

কমিউনিজ্‌ম্‌ !—কথাটা আজ আর নূতন নয়—দোষেরও নয়। বর্তমান যুগে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে-সমস্ত নূতন সমস্যা ও নূতন চিন্তা আসিয়া দেখা দিয়াছে, কমিউনিজ্‌ম্‌ তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই অভিনব মতামত সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানকে আজ প্রভাবান্বিত করিতেছে। এমন দেশ খুব কমই আছে—যেখানে কমিউনিজ্‌মের বাণী পৌঁছায় নাই, অথবা ইহার ভাব ও আদর্শ সংক্রমিত হইয়া পড়ে নাই। সারা পৃথিবীতে সে আনিয়াছে একটা বিপ্লব—একটা বিভীষিকা, সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব বিস্ময়। তার চলার ছন্দে একদিকে বাজে ভাঙার গান, অপরদিকে জাগে নব-সৃষ্টির উল্লাস। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ার মত সে চলিয়াছে দিক হইতে দিগন্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। প্রাচীন পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিয়া সে গড়িতে চায় এক নূতন জগৎ—যেখানে থাকিবে না কোন আভিজাত্য, থাকিবে না কোন ধনসম্পত্তির অসমতা। এই শ্যামল পৃথিবীর মাটিকে...তার ধনরত্নকে সকল মানুষের মধ্যে তুল্যরূপে বন্টন করিয়া দিয়া সে আনিবে এক নবসাম্য নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ সেখানে চলিবে না, সেখানে আসিবে সাধারণতন্ত্র ; সর্ব-সাধারণই হইবে সে দেশের মালিক, তাহারাই করিবে শাসন, তাহারাই করিবে নিয়ন্ত্রণ।

এই অভিনব সাম্য-ব্যবস্থাই হইতেছে কমিউনিজ্‌ম্‌। কাজেই দেখা যাইতেছে, দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্র ও রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থার সহিত

muslimwebs.blogspot.com

ইহার সংঘর্ষ অনিবার্য। কার্যতঃ ঘটিয়াছেও তাই। এই নূতন মতবাদের গ্রহণ-বর্জন সমস্যা লইয়াই আজ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে আরম্ভ হইয়াছে এক ভয়াবহ বিরোধ ও আত্মকলহ। কোন দেশ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, কোন দেশ করে নাই; কোন দেশ ইহার সমর্থক, কোন দেশ ইহার বিরোধী; কোন দেশ ইহাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়া সারা পৃথিবীতে প্রবর্তিত করিতে চায়, কোন দেশ ইহার ধ্বংস কামনা করে। দেশের অভ্যন্তরেও এই প্রশ্ন লইয়া নানা দল গঠিত হইয়াছে। রাজশক্তির ভয়ে কমিউনিজ্‌ম্ যেখানে প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না, সেখানেও সে তলে তলে ক্রিয়া করিতেছে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই কমিউনিজ্‌মের অনুরাগী এক একটা গোপন বা প্রকাশ্য দল আছে, তাহাদিগকে 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলা হয়। দেশের মধ্যে আন্দোলন অথবা বিপ্লব আনিয়া প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে ধ্বংস করাই হইল তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের মতে কমিউনিজমই হইল সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিরোধী, তাহারা বলে: এমন উৎকট সাম্য জগতে অচল; মানুষের ধর্ম, সমাজ, কৃষ্টি ও প্রগতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক, অতএব ইহা সর্বদা পরিত্যাজ্য। কাজেই দেখা যাইতেছে, এই কমিউনিজ্‌মকে ঘিরিয়া সর্বত্রই একটা বিরোধ ও অশান্তি চলিতেছে।

বস্তুতঃ একটা নূতন যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি। কমিউনিজ্‌ম্ সেই নবযুগেরই প্রতীক। এই যুগপ্রবাহকে ঠেকাইয়া রাখাও যেমন মুস্কিল গ্রহণ করাও ঠিক তেমনি মুস্কিল। সকলকেই তাই আজ ভাবিতে হইতেছে; কমিউনিজ্‌ম্ আমরা গ্রহণ করিব, না করিব না? আমাদের জাতীয় আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, স্বভাব ও প্রকৃতি, ধর্ম ও সমাজের পক্ষে কি ইহা অনুকূল? কোথায় ইহার উপকারিতা কোথায়ই বা ইহার ধ্বংসরূপ? এইসব জিজ্ঞাসা আজ সকলের মনকে দোলা দিতেছে। আমাদিগকে তাই একটা স্থির-সিদ্ধান্তে আসিতেই

হইতেছে; বসিয়া থাকা আর চলিতেছে না; যুগের গতিবেগ আজ অত্যন্ত প্রবল।

এই যুগধর্মের আবেদন অন্য সকলের নিকট যেমন আসিয়াছে, মুসলমানদের নিকটও ঠিক তেমনি আসিয়াছে। তবে মুসলমানের সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া মুসলমান কোন নূতন মত বা পথকে সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। প্রত্যেক নূতনকেই সে ইসলামের আলোকে পরখ করিয়া দেখিতে চায়। কমিউনিজ্‌মের বেলায়ও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। মুসলমানদের মনের দুয়ারে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে: কমিউনিজ্‌ম কি মুসলমানের গ্রহণযোগ্য? ইহার কোন প্রয়োজন মুসলিম সমাজে আছে কি? ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই নূতন যুগসমস্যার সমাধান করিতে কি অক্ষম? ইসলামের সহিত কমিউনিজ্‌মের সম্বন্ধ কী? কোন্‌টি সে গ্রহণ করিবে: কমিউনিজ্‌ম না ইসলামিজ্‌ম?

বলা বাহুল্য, এই সব প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধানই হইতেছে আমাদের মূল লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তখনই সম্ভব—যখন ভালরূপে জানা যায় কমিউনিজ্‌ম্‌ই বা কী আর ইসলামই বা কী। উভয়ের সহিত সম্যক-রূপে পরিচিত না হইলে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ-কেমন করিয়া বলা যায়?

আমরা তাই কমিউনিজ্‌মের উৎপত্তি, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তারপর ইসলামের সহিত ইহাকে মিলাইয়া দেখিয়া ইহার দোষ-গুণের বিচার করিব।

কমিউনিজ্‌ম্‌ কী ?

কমিউনিজ্‌ম্‌ হইল চরম সাম্যবাদ।

কিন্তু সাম্যবাদ কী।

সেকথা বুঝাইতে হইলে মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বলিতে হয়।

ইউরোপের ইতিহাস পড়িলে জানা যায়, মধ্যযুগে সর্বত্রই এক-প্রকার জায়গীর-প্রথা বিদ্যমান ছিল। সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন স্বয়ং রাজা। রাজা তাঁহার অধীন বিভিন্ন সামন্ত জমিদার (baron) দিগকে সেই জমি বন্টন করিয়া দিতেন। জমিদারেরা আবার সেই জমি তাঁহাদের অধীন নিম্নভূস্বামীদিগকে বিলি করিতেন। এইরূপে সর্বশেষে কৃষকদিগের মধ্যে সেই জমি বিতরিত হইত। কৃষক ও মজুররা সেই সব জমি আবাদ করিত বটে, কিন্তু কোন জমিতে তাহাদের কোন অধিকার থাকিত না। তাহারা ছিল 'চাষের মালিক' কিন্তু 'গ্রাসের মালিক' নয়। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া তাহারা ফসল উৎপন্ন করিত, কিন্তু সে ফসলের অতি সামান্যই তাহারা পাইত। কখনও বা নির্জলা বেগার খাটিয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কৃষক ও মজুরদিগের তাই কষ্টের অবধি ছিল না।

কালক্রমে এই জায়গীর-প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দেয়। অনেক আন্দোলনের পর এই সামন্ততন্ত্র উঠিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হয় না। স্বেচ্ছাতন্ত্রী সম্রাট ও পুঁজিবাদী-দিগের অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। রুশো (Rousseau) ও ভলটেয়ার (Voltaire) প্রমুখ ফরাসী মনীষী এই স্বৈরতন্ত্রের

বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। রুশো তাঁহার 'Social Contract' নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক মানুষই সমান এবং জন্মতঃ স্বাধীন। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র একটা সামাজিক চুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। সম্রাট হইতে দীনদরিদ্র পর্যন্ত সকলের মধ্যেই একটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে-এই চুক্তির উপরই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালে কালে রাজারা এবং অন্যান্য কুচক্রী লোকেরা শক্তি ও সুবিধা হাতে পাইয়া সেই পবিত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে; তাহারই ফলে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যথায় সকল মানুষই সমান।

এই সাম্যবাদ নিপীড়িত জনমনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করে। ফলে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী-বিপ্লব (French Revolution) সংঘটিত হয়। স্বৈরতন্ত্র ও জমিদারী জুলুম তাহাতে অনেকটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু এইখানেই সমস্যার সমাধান হইল না। কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় আর এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইল।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইল; সঙ্গে সঙ্গে বহু শিল্পকেন্দ্রও (Industrial Centres) গড়িয়া উঠিল। এতদিন যে-সমস্ত জিনিস হাতে তৈরী হইত, এখন তাহা কলে তৈরী হইতে লাগিল। পূর্বে যাহারা জমিদার ও বড়লোক ছিল, তাহারা যখন দেখিল জমি-দারিতে সুবিধা হইবে না, তখন তাহারা নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে মূলধন খাটাইতে আরম্ভ করিল। সেই সব কলকারখানায় বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইল। গরীব লোকেরা অভাবের তাড়নায় দলে দলে সেই সব কারখানায় কাজ করিতে বাধ্য হইল। কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদিগকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়া নিজেরা প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। ফলে সমাজে আবার ভীষণ

www.cdlb.com.bd

ভেদ-বৈষম্য দেখা দিল। অল্প সংখ্যক লোক বড়লোক হইতে লাগিল আর লক্ষ লক্ষ লোক দীনদরিদ্রই রহিয়া গেল। এই ধন-বৈষম্য ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এইরূপে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হইল।

সামন্তবাদের (Feudalism) পরে তাই আসিল পুঁজিবাদ বা Capitalism, দরিদ্র জনসাধারণকে শোষিত (exploit) করিয়া অর্থ সঞ্চয় করাই হইল পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তখন আবার আন্দোলন শুরু হইল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়াই এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া কিরূপে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, চিন্তাশীল মনীষীদিগের তাহাই হইল প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ইহা হইতেই হইল সমাজতন্ত্র বা Socialism-এর সৃষ্টি। দেশের জাতীয় ধনসম্পদ ও উৎপন্ন আয়ের সমীকরণই হইল Socialism-এর প্রধান লক্ষ্য।

এই সোশ্যালিজ্‌মেরই চরম রূপ হইল কমিউনিজ্‌ম্‌। কমিউনিজমও সাম্যবাদ, তবে উগ্র সাম্যবাদ। লক্ষ্য উভয়েরই মূলতঃ এক, তবে উপায় ও পদ্ধতি বিভিন্ন। দেশের যাবতীয় ধনসম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত অধিকার (private ownership) তুলিয়া দিয়া সমবায়করণ (collectivization) উভয়েরই লক্ষ্য। তবে সোশ্যালিজ্‌ম চায় শান্ত উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে, আর কমিউনিজ্‌ম চায় বিপ্লবের মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে। কমিউনিজম এমন এক নূতন রাষ্ট্র বা সমাজতন্ত্র গড়িতে চায়, যেখানে কোন শাসক থাকিবে না ; নিজেরাই নিজেদের দেশের জন্য কাজ করিবে এবং যার যে পরিমাণ দরকার, তাহাই সে লইতে পারিবে। সূর্যের আলোক পর্যাপ্ত পরিমান ছড়ান রহিয়াছে। যার যতটুকু দরকার, সে ততটুকুই লইতেছে, তাহাতে কেহই বাধা দিতেছে না। কমিউনিজ্‌মের

আদর্শও হইবে তদ্রূপ। দেশবাসীদের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া রাখা হইবে, তারপর সেই সম্পদ হইতে প্রয়োজন মত যার যত খুশী লইতে পারিবে। "From each according to his capacity to each according to his needs"(অর্থাৎ যোগ্যতা অনুসারে পাইতে পাইতে পরিণামে যার যত প্রয়োজন সে তত পাইবে।) ইহাই হইল কমিউনিজমের চরম লক্ষ্য। কিন্তু সোশ্যালিজম সে কথা বলে না। সে বলে স্টেট হইতে সকলকেই দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু যে যত চায় তাকে ততই দেওয়া হইবে না ; যে যেরূপ কাজ করিবে (according to his work) তাকে সেইরূপ দেওয়া হইবে।

কমিউনিজম তাই পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। শুধু পুঁজিবাদ নয় ; যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) এই পুঁজিবাদেরই পরিণতি, কাজেই কমিউনিজম সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ সাধন করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই কমিউনিজমের প্রধান লক্ষ্য।

কমিউনিজম যখন প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার কোন-কিছুই রাখিতে চায় না ; জমিদার, মহাজন, ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে সে যখন একেবারে নির্মূল করিতে চায়, তখন বণিক সম্প্রদায়ই বা ইহাকে ছাড়িবে কেন ? এমন বেকুফ কে আছে যে নিজের ধনসম্পত্তি ও রাজ্য-মান পরকে বিলাইয়া দেয় ? কাজেই সাম্রাজ্যবাদী, ধনিক বা অভিজাত সম্প্রদায় কেহই কমিউনিজমকে দু'চোখ পাতিয়া দেখিতে পারে না। কমিউনিজম চায় তাহারাই—যাহারা নিঃস্ব-দরিদ্র বা না-পাওয়ার দল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গোটা সমাজ মোটামুটিভাবে দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া আছে ঃ (১) পাওয়ার দল (haves) আর (২) না পাওয়ার দল (have-nots)। পাওয়ার দলকে 'বুর্জোয়া সম্প্রদায়' (bourgeouis) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, আর না পাওয়ার দলকে

বলা হইয়াছে "প্রোলেটারিয়েট' (proletariat) বা বঞ্চিতদের দল। কমিউনিজমের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই দুই দলের সংঘর্ষেরই ইতিহাস।

কমিউনিজম শক্তির পূজারী। শান্ত প্রচারণায় তাহার বিশ্বাস নাই। সে বলে : শক্তিহীনের অলস আবেদন শুনিবে কে? সাম্যবাদ আনিতে হইলে তাই তার পিছনে চাই শক্তির সাধনা? কমিউনিজম তাই বিপ্লবপন্থী।

শুধু আবার একদেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হইলেই কমিউনিষ্ট দল সন্তুষ্ট নয়। সমস্ত জগতে তাহারা নিজেদের আদর্শকে জয়যুক্ত দেখিতে চায়। অধিকাংশ দেশই তাই কমিউনিজমকে বড় ভয় করিয়া চলে। কমিউনিষ্ট দল প্রবল হইয়া পাছে সব কিছুর ওলট-পালট ঘটাইয়া দেয়—এই ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীরা সতত সন্ত্রস্ত।

বর্তমানে একমাত্র রাশিয়াতেই পুরাপুরিভাবে কমিউনিজম গৃহীত হইয়াছে। (১) তাও বেশী দিনের কথা নয়—এই সেদিন-মাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রের (Tsarism) বিলোপ-সাধন করিয়া তথায় এই নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের শাসন, সংরক্ষণ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাভার এখন জনসাধারণের হাতে। সেখানে রাজা নাই, প্রজা নাই, জমিদার নাই, রাষ্ট্র (State) সেখানে সাধারণের সম্পত্তি। রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই সেখানে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুসারে খাটিতেছে, তদ্বিনিময়ে রাষ্ট্রই তাহার সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ও সুখ-শান্তির বিধান করিতেছে।

বিশ্ববিশ্রুত রুশ জননায়ক লেনিনই (Lenin) রাশিয়াতে কমিউনিজমের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন এই নবপ্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের প্রথম ডিক্টেটর (Dictator)। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন (Marshal Stalin) এখন রাশিয়ার কর্ণধার। ষ্ট্যালিনের হস্তেও কমিউনিজম বিরাট শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

(১) জেকোস্লাভিয়া এবং চীন দেশেও সম্প্রতি কমিউনিজম প্রসার লাভ করিতেছে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, আমেরিকা, জাপান-কোন দেশেই কমিউনিজ্‌ম শাসন নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। তবে প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক একটা কমিউনিষ্ট পার্টি আছে। বিরুদ্ধ রাজশক্তির চাপে পড়িয়া তাহারা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে না পারিলেও তলে তলে অশান্তি ও অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছে।

ইংলণ্ড ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism), ফ্রান্স, তুরস্ক, স্পেন ও আমেরিকায় সাধারণতন্ত্র (Republicanism), ইটালীতে ফ্যাসিতন্ত্র (Fascism) এবং জার্মানিতে নাৎসীতন্ত্র (Nazism) প্রচলিত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ বহুদিন হইতে একটা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র আন্দোলন (International Socialist Movement) চালাইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ছোট খাট দুই একটি স্থান ছাড়া ব্যাপকভাবে আজ পর্যন্ত রাশিয়ার অনুসৃত সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম অন্য কোথায়ও গৃহীত হয় নাই। গত দুইটি মহাসমরে রাশিয়ার সহিত যদিও রাজনৈতিক কারণে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মিলন ঘটিয়াছে, তবু একথা ঢাকিবার উপায় নাই যে রাশিয়ার কমিউনিজ্‌মকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা দস্তুর মত ভয় করিয়া চলে এবং সজাগ প্রহরীর মত সর্বদা বাধা দিয়া রাখে। শুধু ইংলণ্ড ও আমেরিকা কেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালী—ইহারাও কমিউনিজ্‌মের ঘোর বিরোধী।

ইহাই হইল বর্তমান জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

কমিউনিজ্‌মের ইতিহাস

বিখ্যাত জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস (Karl Marx)-ই কমিউনিজমের আদি প্রবর্তক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানির অন্তর্গত Treves নগরে মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) শিষ্য ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হেগেল হইতে এক স্বতন্ত্র মত প্রচার করেন। এই নূতন মতবাদের জন্য জার্মানীর তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়; ফলে তিনি জার্মানি হইতে বিতাড়িত হন। প্রথমতঃ তিনি ফ্রান্সে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন; পরে সেখান হইতেও বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মার্কস ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, মার্কস জাতিতে জার্মান হইলেও এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহায়তায় এই বিপ্লবমূলক নবসাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও জার্মানি, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার প্রচারিত মতবাদ গ্রহণ করে নাই; বরং ইহার বিরোধিতাই করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে রাশিয়ার ন্যায় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক দেশ এই মতবাদ শুধু যে নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়, দিকে দিকে ইহার বাণীও প্রচার করিয়া ফিরিতেছে।

মার্কস্ ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক বা Socialist. অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। তবে তাঁহার সমাজতন্ত্রের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনি তাঁহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। এই জন্যই তাঁহার সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) বলা হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কস যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স (Frederich Engels) আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। এঙ্গেলসও মার্কসের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। তখন উভয়ে মিলিয়া নিজেদের মতবাদ প্রচার করিবার জন্য গোপনে একটা পার্টি বা সেল গঠন করেন, তাহার নাম দেন League of Communists. ইহার কিছু পরেই মার্কস প্যারীস ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স নিজেদের মতবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া একটি ইশতেহার প্রচার করেন, তাহার নাম দেন "Manifesto of the Communist party" সেই হতেই 'কমিউনিষ্ট' এবং 'কমিউনিজম' কথার প্রচলন হয়। কমিউনিষ্টদের মত ও পথই হইল কমিউনিজম অথবা কমিউনিজমের নীতি ও আদর্শ যাহারা গ্রহণ করে, তাহারাই কমিউনিষ্ট।

কমিউনিজমের ইতিহাসে কমিউনিষ্ট ইশতেহারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। আমরা নিম্নে উক্ত ইশতেহারের একটা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। তাহা হইতেই পাঠক ধারণা করিতে পারিবেন—কমিউনিজম কী এবং তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কী।

কমিউনিষ্ট ইশতেহার

ইশতেহারের প্রথমে দেখান হইয়াছে ধনতন্ত্রের (Capitalism) কুফলের নানা দিক। শ্রমিকশ্রেণী (proletariats) বুর্জোয়া শ্রেণীর (bourgeoisie) দ্বারা কিভাবে শোষিত হইতেছে অতি বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে যত যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, তার সবগুলিই যে শ্রেণী সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নয় সকলেরই মূলে আছে যে ধন-বৈষম্যের অভিশাপ, এই কথাই ইশতেহারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের মত এই যে, যতদিন এই ধন-বৈষম্য থাকিবে, ততদিন জগতে শান্তি আসিবে না। তাই চাই ধন-সম্পত্তির সম-বিতরণ ব্যবস্থা, অর্থাৎ ধনিকদিগের হাত হইতে সমস্ত অর্থ ও ভূসম্পত্তি ছিনাইয়া লইয়া সকলের মধ্যে তুল্যরূপে বন্টন করিয়া দেওয়া। একাজ কোনরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক বিদ্রোহ।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দশটি উপায় নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেগুলি এই ঃ

(১) ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি তুলিয়া দিয়া সেগুলিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং দেশের যাবতীয় আয় সাধারণের কাজে লাগাইতে হইবে।

(২) খুব মোটা রকমের আয়-কর বসাইতে হইবে।

(৩) ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন তুলিয়া দিতে হইবে।

(৪) যাহারা বিদেশী, অথবা কমিউনিজমের বিরোধী, তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।

(৫) সমস্ত আয় ষ্টেটের মূলধন (State Capital) রূপে পরিগণিত হইবে।

(৬) সমস্ত যাতায়াতের উপায় (means of communication) ষ্টেটের কর্তৃত্বাধীনে আসিবে।

(৭) ষ্টেটের তত্ত্বাবধানে দেশে শিল্প ও কৃষির বিস্তার করিতে হইবে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গঠন করিয়া জমির উৎপত্তিশক্তি বাড়াইতে হইবে।

(৮) প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজ করিতে হইবে।

(৯) কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। শহর ও পল্লীর পার্থক্য দূর করিতে হইবে, জনসংখ্যাকে সমানভাবে শহর ও পল্লীগ্রামে ছড়াইয়া দিতে হইবে;

(১০) সরকারী স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া ছেলেমেয়েদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হইবে; অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে শ্রম হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইবে; শিক্ষার সহিত শিল্পের যোগস্থাপনা করিতে হইবে।

সর্বশেষে বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে এই পরিবর্তন আনিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে :

"Working men of all countries, unite."

অর্থাৎ : সকল দেশের শ্রমিকদল সংঘবদ্ধ হও।

এই ইশতেহার প্রথমতঃ জার্মান ভাষায় লিখিত হয়, পরে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালে মার্কসের জীবন খুব অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। এই সময়ে এঙ্গেলস্ যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিয়া ত্যাগ ও বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

১৮৫০ হইতে ১৮৬০—এই দশ বৎসর কাল মার্কস্ ইংলণ্ডের বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে বসিয়া নিজের মতবাদ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। মার্কসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Capital (Das Kapital) এই নীরব সাধনারই ফল।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে মার্কস্‌ International Workers' Association নামক একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করেন। ইহাই পরে First International নামে অভিহিত হয়। এই সম্মেলন বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিই এই সম্মেলনে যোগদান করে। কিন্তু ইহাতেও মার্কস্‌ নিরুৎসাহ হয় নাই; তাঁহার আন্দোলন সমভাবে তিনি চালু রাখেন।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে মার্কসের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আন্দোলনের মৃত্যু হয় না। মার্কসের পর এঙ্গেল্‌স্‌ এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে এঙ্গেল্‌সের উদ্যোগে লণ্ডন নগরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহারই নাম Second International. প্রায় সমস্ত দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতারা তাঁহাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন না। ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়: একদল নরমপন্থী, আর একদল উগ্রপন্থী। নরমপন্থীরা বলে: শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও প্রচারণা দ্বারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং যে দেশ ইহাকে গ্রহণ করিবে, সেই দেশেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু উগ্রপন্থীরা বলে: শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র আসিবে না; বিপ্লবের মধ্য দিয়া উহাকে আনিতে হইবে এবং এই বিপ্লবের বন্যা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশে এই মতবিরোধ কিরূপ বিভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করে, সেকথা যথাস্থানে বলা হইবে।

অন্যান্য দেশে কমিউনিজ্‌ম বিশেষ কোনই পরিবর্তন আনিতে পারিল না, কিন্তু রাশিয়াতে আনিল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

তখন রাশিয়াতে ছিল স্বেচ্ছাচারী জারের (Tsar) শাসন। জারের অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্রাট, জমিদার, মহাজন—সকলেই শ্রমিক ও কৃষকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। মার্কসের বাণী তাই তাহাদের প্রাণে নব উন্মাদনা সৃষ্টি করিল। কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত মেনশেভিকেরা সশস্ত্র বিদ্রোহ পছন্দ করিল না; কিন্তু লেনিন দেখিলেন, বিপ্লব ও রক্তপাত ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তখন তিনি মেনশেভিকদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবার উদ্দেশ্যে নিজ পার্টির নামকরণ করিলেন 'কমিউনিস্ট পার্টি' এবং নিজদিগকে পরিচয় দিলেন 'কমিউনিস্ট' (Communist) বলিয়া। সেই হইতেই 'কমিউনিস্ট' ও 'কমিউনিজম' কথাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গেল। শুধু রাশিয়ায় নয়, অন্যান্য দেশের উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রীরাও এই নাম গ্রহণ করিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে: লেনিনই কমিউনিজমের কার্যকরী প্রতিষ্ঠাতা। কমিউনিজমকে তাই অনেক সময় 'লেনিনিজম' (Leninism) বলা হয়। বলশেভিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌ মূলতঃ এক।

লেনিনের হাতেই কমিউনিজমের মোড় ফিরিল। জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া কমিউনিস্ট পার্টি যখন জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের হাত হইতে রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিল, তখন মার্কস প্রচারিত কমিউনিজমের শুষ্কদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। সত্যই কমিউনিজম্‌ রাশিয়াতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিল। লেনিনের সময় হইতে রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস তাই কমিউনিজমেরই ইতিহাস। সুতরাং আমরা এখন দেখিব—রাশিয়াতে কমিউনিজ্‌ম কি ভাবে প্রসার লাভ করিল এবং তাহার ফল কী হইল।

রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌ম্‌

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কসের নব সাম্যবাদ রাশিয়াতে প্রথম প্রবেশলাভ করে। এই সময় মার্কসের মতবাদ অন্যান্য দেশেও (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি ইত্যাদি) প্রচারিত হয়; ফলে সকল দেশেই এক একটি সমাজতন্ত্রী দল (Socialist party) গড়িয়া উঠে। ইহাদের দেখাদেখি রাশিয়াতেও একটি সমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি হয়।

লেনিন ছিলেন মার্কস পন্থী। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার অন্তর্গত Simbrisk নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন স্কুলমাষ্টার। শিক্ষা শেষ করিয়া লেনিন আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। গোপনে গোপনে তিনি তথাকার শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। নানা-স্থানে সভাসমিতি করিয়া তিনি শ্রমিকদিগের মধ্যে পুঁজিবাদিদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে থাকেন এবং পরে রাশিয়াতে বল-শেভিক পার্টি গঠন করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টিতে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে দুইটি শাখার উদ্ভব হয়-মেনশেভিক ও বলশেভিক। মেনশেভিকেরা নরমপন্থী, লেনিন এই শেষোক্ত দলকে চালিত করেন এবং পরে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'কমিউনিষ্ট পার্টি রাখেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা একটি ছোট খাটো বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন; কিন্তু মেনশেভিকদিগের বিরোধিতায় তাহা তত ফলপ্রসূ হয় না। লেনিন ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে থাকেন; ফলে তিনি কর্তৃ-পক্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং শীঘ্রই দেশ হইতে নির্বাসিত হন।

১৯০৭ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেনিন প্যারী, ভিয়েনা এবং জার্মানিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সোশ্যালিষ্ট পার্টি একত্রে একটি মন্তব্য গ্রহণ করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে (ইংলণ্ড, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি) এই মর্মে এক সতর্কবাণী প্রেরণ করে যে, তাহারা যদি কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাধায়, তবে সোশ্যালিস্টরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। সোশ্যা-লিস্টরা মনে করে, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসেই দুর্বল জাতিদের সহিত যুদ্ধ বাধায়। কল-কারখানা, খনি প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদীদের নূতন নূতন বাজারের (market) প্রয়োজন হয়। নিজেদের কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং নূতন নূতন দেশ হইতে কয়লা, তেল, তুলা, পাট প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের মতলবে পুঁজিবাদীরা নূতন নূতন দেশ জয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাহারা জানে, যে-সব দেশের সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত আছে, সেই সব দেশ নিজেদের আয়ত্তাধীনে না আনিলে তাহাদের সুবিধা হয় না। তাছাড়া দেশে দেশে যুদ্ধ লাগিলে নিজেদের কল-কারখানায় প্রচুর যুদ্ধোপকরণ তৈরী করিবার এবং সেগুলি বিক্রয় করিয়া আশা-তীতরূপে লাভবান হইবার মহাসুযোগও তাহাদের জুটে। এক একটা বড় বড় মিলিটারী অর্ডার বা কনট্রাক্ট লইতে পারিলে কত লাভ! এইজন্যই পুঁজিবাদীরা চায় যুদ্ধ। অনেক সময় বড় বড় যুদ্ধের মূলে থাকে এই পুঁজিবাদীদের কারসাজি। কমিউনিজ্‌ম এই জন্যই এই শ্রেণীর যুদ্ধবিগ্রহের ঘোর বিরোধী। একেই ত ইহা দ্বারা দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তাহার উপর আবার পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করে। এই জন্যই সোশ্যালিস্টরা এইরূপ একটি ইশতেহার দিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, অমনি প্রত্যেক দেশের সোশ্যালিস্টরা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয়তাবাদী সাজিয়া বসিলেন এবং স্বদেশের গভর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। এমন কি জার্মানি যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন মেনশেভিকরাও দস্তুরমত জারের সহায়তা করিতে লাগিল। নরমপন্থী সোশ্যালিস্টদের এই অধঃপতন দেখিয়া লেনিন দূর হইতেই তীব্রস্বরে ইহার প্রতিবাদ জানাইলেন এবং ইহার প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

চারি বৎসর যুদ্ধ চলিল। লেনিন তখন জার্মানিতে। কাইজার দেখিলেন, লেনিনকে যদি এই সময় রাশিয়াতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে জারের বিরুদ্ধে সে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং এই অন্তর্বিপ্লবের ফলে জার্মানির বিশেষ সুবিধা হইবে। এই মতলবে কাইজার লেনিনকে দেশে পাঠাইবার নির্দেশ দিলেন। ট্রেনের দরজায় সিল-মোহর করিয়া লেনিনকে রাশিয়ায় পাঠান হইল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লেনিন বলশেভিকদিগের মহা উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে পিটার্সবার্গ স্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকদের অন্তরে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল; লেনিনের নেতৃত্বে তাহারা জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহ 'ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ' (February Revolution) নামে পরিচিত। এ সময়ে আর একজন উপযুক্ত রুশ-নেতাও লেনিনের সহিত যোগ দেন। ইনি ট্রট্‌স্কী (Trotsky)। ১৯১৭ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহার ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং বলশেভিক পার্টিই জয়যুক্ত হইয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। সম্রাট নিকোলাস বলশেভিকদের হস্তে বন্দী হইয়া একাটারিনবার্গে (Ekaterinburg) নির্বাসিত হন এবং পরে শোচনীয়ভাবে

তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই হইতেই রাশিয়ায় গণতন্ত্রমূলক নেতৃশাসন (Dictatorship of the Proletariat) প্রবর্তিত হইয়াছে। লেনিন ছিলেন এই গণতন্ত্রের প্রথম ডিক্টেটর।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেনিন আর একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন আহবান করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। মস্কোতে এই সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলন "তৃতীয় অথবা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন" (Third or the Communist International) নামে সুপরিচিত। এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লেনিন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্‌স্কীরা শিয়ার কর্ণধার হইবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহাকে আর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয়; ইনি মার্শাল ষ্ট্যালিন (Marshal Stalin)। ট্রট্‌স্কী ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে মতের ঐক্য হয় নাই। ষ্ট্যালিন রাশিয়াতেই কমিউনিজমকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান; ট্রট্‌স্কী রাশিয়া ছাড়া অন্যান্য দেশেও বিপ্লবের মধ্য দিয়া কমিউনিজম প্রচার করিতে চান। এই মতানৈক্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ আনিয়া দেয়। অবশেষে ষ্ট্যালিন জয়লাভ করেন এবং ট্রট্‌স্কী ককেশাস প্রদেশে নির্বাসিত হন। সেখান হইতে পরে তাঁহাকে ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রট্‌স্কী ছিলেন খাঁটি মার্কসপন্থী; ষ্ট্যালিনের নীতি ও পদ্ধতিকে তাই তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধদল আরও চটিয়া যায়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে ট্রট্‌স্কী নিহত হন।

সেই হইতে ষ্ট্যালিনই নির্বিঘ্নে রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। ষ্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় অভূতপূর্ব উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

রাশিয়া এখন আর পূর্বের রাশিয়া নাই। ইহার নামকরণ হইয়াছে 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' বা 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স্' (Union of soviet socialist Republics)। ইহারই সংক্ষিপ্ত নাম 'ইউ-এস্-এস্-আর' (U.S.S.R.)।

আমরা সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব।

সোভিয়েট রাশিয়ার পরিচয়

সোভিয়েট ইউনিয়ন বা U. S. S. R. কী?

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার ইতিহাসে সোভিয়েট (Soviet) কথাটি সর্বপ্রথম দেখা দেয়।

পাঠক জানেন, রাশিয়া একটি বিরাট দেশ। বহু প্রদেশ ও বহু জাতির দ্বারা এই সাম্রাজ্য গঠিত। ১৫৮টি জাতি ও উপজাতি এই বিশাল দেশে বাস করে। তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্বতন্ত্র। ইউরোপ ও এশিয়া—উভয় মহাদেশেই রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তার। রাশিয়ার যে অংশ ইউরোপে, তাহাকে শ্বেত রাশিয়া (White Russia) বলা হয়। বর্ণে, শিক্ষায়, সভ্যতায়, অর্থসম্পদে ও ক্ষমতায় শ্বেত-রাশিয়ানরাই ছিল অন্যান্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে, জারতন্ত্রের আমলে এই শ্বেত-রাশিয়ানরা এশিয়াটিক রাশিয়ানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত এবং সর্বতোভাবে তাহাদিগকে দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। ইউক্রেনিয়ান, পোল, আজারবাইজান, জর্জিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, টার্কোম্যান, উজবেক, তাজিক, কসাক, কিরগিজ, ল্যাটাভিয়ান, লিথুয়ানিয়ান, ইস্টোনিয়ান ইত্যাদি বহু জাতিই জার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। জাতি হিসাবে তাহারা ত নিগৃহীত হইতই, তাহার উপর আবার দেশে জমিদার-মহাজনদিগের অত্যাচারও কম ছিল না। শ্রমিক ও কৃষকেরা মালিকদের হস্তে নানাভাবে উৎপীড়িত হইত। যাহাতে তাহারা কোনক্রমেই মাথা তুলিতে না পারে, ইহাই ছিল জার-শাসনের মূলনীতি ও লক্ষ্য।

এই নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হইল না। ফরাসী দেশের বিপ্লব মন্ত্র এবং কার্ল মার্কসের অপরূপ সাম্যবাণী নিপীড়িত জনমনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। স্বাধীনতা ও আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন তাহাদের মনে জাগিল। চাষী, মজুর ও অন্যান্য শ্রমিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাই ক্রমশঃই একটা ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার ভাব দানা বাঁধিতেছিল। এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা দিতেছিলেন লেনিন। তাঁহারই চেষ্টায় দেশের সর্বত্র গুপ্ত-সমিতি গঠিত হইতেছিল। এই সমিতিগুলির নামই ছিল 'সোভিয়েট' (Soviet)। রুশ ভাষায় সোভিয়েটের অর্থ 'সমিতি' বা সংঘ।

এই সোভিয়েটগুলিই হইতেছে রাশিয়ার নবগঠিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিমূল। বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন 'ইউনিয়ন বোর্ড' স্থাপিত হইয়াছে, সোভিয়েটগুলিও অনেকটা সেইরূপ। কতিপয় ইউনিয়ন লইয়া এক একটি বোর্ড, কতিপয় লোকাল-বোর্ড লইয়া এক একটি ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড। সোভিয়েট-তন্ত্রও সেইরূপ। বিভিন্ন বোর্ডের মেম্বর নির্বাচন যেমন গণভোটের দ্বারা সাধিত হয়, সোভিয়েটগুলির মেম্বরও ঠিক সেইরূপ ভাবে নির্বাচিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান যেমন সেই জেলার সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান কর্মকর্তার তেমনি ইহার নির্বাচিত ডিক্টেটর। ছোট ছোট সোভিয়েট দ্বারা উচ্চতর সোভিয়েট গঠিত। সর্বোচ্চ সোভিয়েটের নাম হইল 'সুপ্রীম সোভিয়েট' (Supreme Soviet)। আইনঘটিত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই সুপ্রীম সোভিয়েটের। গণভোটের দ্বারাই এই সুপ্রীম সোভিয়েট গঠিত। প্রতি চারি বৎসর অন্তর এই সুপ্রীম সোভিয়েট গঠিত হয়। এই সুপ্রীম সোভিয়েটের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি প্রভৃতি পদ আছে। সেগুলিও ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এইরূপ স্বয়ংশাসিত এক একটি প্রদেশকে 'রিপাবলিক' (Republic) বলে। এক একটি রিপাবলিকের অধীন অনেকগুলি সোভিয়েট থাকে।

বর্তমান রাশিয়া এই ধরনের ষোলটি রিপাবলিকে বিভক্ত। প্রত্যেক রিপাবলিকই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। প্রত্যেক রিপাবলিককে 'সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' (Soviet Socialist Republic) বলা হয় এবং এক একটা প্রদেশ বা জাতির নামানুসারেই সেই রিপাবলিকের নামকরণ হয়, যথা—ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, উজবেক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, তাজিক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইত্যাদি। এই রিপাবলিকগুলির প্রত্যেকটিতেই স্বরাজ স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের দেশ শাসন করিতেছে। কিন্তু ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। রিপাবলিকগুলিকে মিলাইয়া আবার একটা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন (Union) গঠিত হইয়াছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের নামই হইল ইউনিয়ন অব দি সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস (Union of the Soviet Socialist Republics)। প্রত্যেক রিপাবলিক হইতে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি লইয়া এই ইউনিয়ন গঠিত। এই ইউনিয়নের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় ডিক্টেটর (dictator)। প্রতি চারি বৎসর অন্তর ডিক্টেটর-নির্বাচন হয়। মার্শাল ষ্ট্যালিনই ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার ডিক্টেটর।

নিম্নলিখিত ১১টি রিপাবলিক লইয়া সর্বপ্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হয় ঃ

(১) রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেটিভ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(২) ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৩) বাইলো-রাশিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৪) আজারবাইজান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৫) জর্জিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৬) আর্মেনিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৭) টার্কোম্যান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৮) উজবেক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক
(৯) তাজিক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(১০) কসাক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(১১) কিরগিজ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

পরে নিম্নের পাঁচটি রিপাবলিককেও ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে :

(১) ল্যাটাভিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(২) লিথুয়ানিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(৩) এস্টোনিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(৪) ক্যারোলিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

(৫) মলডেভিয়ান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক

সর্বমোট ষোলটি রিপাবলিক লইয়া বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়া গঠিত। শুনিলে আশ্চর্য লাগে, প্রথম ১১টি রিপাবলিকের মধ্যে পাঁচটি হইল মুসলিম-শাসিত দেশ, যথা : টার্কোম্যান সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, উজবেক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, তাজিক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, কসাক সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক এবং কিরগীজ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক। ইহাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন এবং আত্মনিয়ন্ত্রনশীল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়া অনেকগুলি স্বয়ংশাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রেরই মিলিত রূপ। সমস্ত দেশটিকে জাতিগতভাবে বিভক্ত করিয়া পুনরায় সেগুলিকে জোড়া লাগান হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। শুধু স্বাধীনতাই স্বীকার করা হয় নাই, ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকারও (Right of Cecession) প্রত্যেকের আছে। প্রত্যেক রিপাবলিক আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিতেছে। ইউনিয়ন সে বিষয়ে কোনই হস্তক্ষেপ করিতেছে না। পক্ষান্তরে ইউনিয়নে যোগ দিবার অথবা বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও প্রত্যেককে

দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন বিষয়ে অসুবিধা বা মতানৈক্য ঘটে তবে যে-কোন রিপাবলিকই ইউনিয়ন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে পারিবে—এইটিই হইল বিধান। যাঁহারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। খণ্ডকে স্বীকার না করিলে অখণ্ডকে পাওয়া যায় না।

এইখানে পাকিস্তানের কথা আসিয়া পড়ে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে মুসলমানেরা যখন পাকিস্তান দাবী করিল, তখন কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের যুক্তি দেখাইয়া পাকিস্তানের দাবীকে অস্বীকার করে। কিন্তু সে দাবী টিকে নাই। সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া পাকিস্তান এখন বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে।

রাশিয়াতে যখন বলশেভিজম প্রচারিত হয় এবং বলশেভিক পার্টি যখন রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করিবার শর্তে সকলকে একত্রিত করিয়া জারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আনিতে চায়, তখনও এই অখণ্ডতার যুক্তি দেখাইয়াই বিরোধী পক্ষ সকলকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী লেনিন বুঝিয়াছিলেন—ইহা স্বাধীনতা লাভের যুক্তি নয়—রাজতন্ত্রকে কায়েম রাখিবারই যুক্তি। তাই তিনি এবং তাঁহার পার্টি এ-যুক্তি মানেন নাই। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করিয়াই তিনি সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন এবং এইরূপেই গোটা দেশের মুক্তি আনিয়াছিলেন। ইহার ফলে কী হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিতেছেন।

সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে রাশিয়া জোর কদমে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, বাণিজ্য ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্য দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র হইতেই দেশের যাবতীয় শিল্প ও গঠন কার্য সাধিত হইতেছে।

এক সঙ্গে সব কাজে হাত দিলে কোনটিই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, তাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতি পাঁচ বৎসরের মত এক একটি কার্য-তালিকা গ্রহণ করিয়া জাতিগঠন-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাকেই 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' বা 'Five years plan' বলা হয়। ১৯২৭ খৃস্টাব্দ হইতে এই কার্যক্রম আরম্ভ হইয়াছে। যে সব দেশে পূর্বে জ্ঞান-সভ্যতার কোন নিদর্শনই পাওয়া যাইত না, আজ সেখানে হাজার হাজার স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, সিনেমা ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়ায় এখন কেহই আর দরিদ্র নাই। সকলেই এখন সমৃদ্ধ ও উন্নত।

নূতন শাসনে রাশিয়ায় যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেই।

সোভিয়েট রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের মূলনীতি হইতেছে—প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা। যতগুলি রিপাবলিক লইয়া এই ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককেই শুধু যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination) দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকারও (Right of Cecession) তাহাদের আছে; অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে তাহারা এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, নাও পারে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে তদন্তর্গত প্রত্যেক জাতির বা রিপাবলিকের স্বার্থ ও সুবিধা, অভাব ও অভিযোগের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতে হয়। রিপাবলিকগুলিকে এই শর্তেই একত্রিত করা হইয়াছে যে, যদি কাহারও কোন অসুবিধা হয়, অথবা কাহারও স্বার্থ বিপন্ন হয়, তখনই সে ইউনিয়ন হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা, স্বার্থ, সংস্কৃতি ও সংস্কারকে মানিয়া লইবার মত উদার মনোভাব এবং সত্যিকার কল্যাণবোধ না থাকিলে এতবড় যুক্তরাষ্ট্র-গঠন কখনও সম্ভব হইতে পারিত না।

রাশিয়াকে এখন তাই আর সাম্রাজ্য বলা চলে না। সাম্রাজ্য বলিলে তাহার প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ধারণাও মনে জাগে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলিলে বন্ধু বা সমান অংশীদারের ধারণারই সঞ্চার হয়। রাশিয়া এখন রাশিয়ানদের সাধারণ সম্পত্তি।

রাশিয়ায় এখন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নাই। পূর্বে যেরূপ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিত এবং সব সুখ-সুবিধা নিজেরাই

ভোগ করিত, এখন আর সেরূপ নাই। এসব সমস্যা তখনই জাগে —যখন পাওয়ার দল না-পাওয়ার দলকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চায়। সংকীর্ণ স্বজাতিপ্রীতি, জঘন্য স্বার্থপরতা ও মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধিই এই মানসিকতার উৎস-মূল। যোগ্যতা অযোগ্যতার যুক্তিও আসে এই সংকীর্ণতা হইতে। এ সমস্তই মানুষকে কিছু না-দিবার ফন্দী। আমরা শিক্ষায়, সভ্যতায়, ধনে, মানে বড় হইয়াছি, কাজেই আমরা যোগ্য আর যতকিছু সুখ-সুবিধার অধিকারী ; আর উহারা অশিক্ষিত, অনুন্নত, অস্পৃশ্য, উহারা আমাদের নীচে থাকিতে বাধ্য ; অথবা আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; কাজেই আমরাই অধিকাংশ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিব, আর উহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ; কাজেই উহারা কম পাইবে-এ যুক্তি তাহারাই দিবে, যাহারা নীচমনা ও স্বার্থপর। সত্যিকার দেশ-প্রেম এ নয়। দেশের যাহারা মুক্তিকামী, দেশের যাহারা সেবক, তাহাদের যুক্তি ও চিন্তা অন্যরূপ। তাহারা বলিবে : "সমগ্র দেশ আমাদের, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই আমাদের দেশবাসী—সবাই আমাদের ভাই। আমরা শিক্ষিত হইয়াছি, আমাদের ভাই-দিগকেও শিক্ষিত করিব ; আমরা যে সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতেছি, আমাদের ভাইদিগকেও সেই সুখ ও সুবিধা দান করিব ; আমরা যোগ্য হইয়াছি, অন্যান্য সকলকেও আমাদের মত যোগ্য করিয়া তুলিব ; অনুন্নতদের কেহ নাই, আমরাই তাহাদের সুখ-সুবিধার বিধান করিব।" যাহারা সত্যিকার দেশ-প্রেমিক, তাহারা কখনও বলিবে না : "এই যে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি দেখিতেছ, এই সব আমাদের টাকায় স্থাপিত, আমরা কেন অনুন্নতদের ইহাতে অধিকার দিব? শিক্ষাক্ষেত্রে উহাদের আদৌ কোন দান নাই, উহারা কেন এটা সেটা দাবী করিবে?" তাহারা বরং ঠিক ইহার বিপরীত পথ দিয়া আসিবে। সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত বাধাবন্ধন দূর করিয়া দিয়া উন্নতরাই অনুন্নতদের সর্ববিধ উন্নতিসাধনের ব্রত গ্রহণ করিবে।

লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীরা ঠিক এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। জাতিভেদ ও যোগ্য-অযোগ্যের প্রশ্ন মন হইতে সরাইয়া দিয়া সকল দেশবাসীকেই তাঁহারা সমভূমিতে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, প্রত্যেককে সমান অধিকার দিলেন এবং অনুন্নত সমাজের যেখানে যে অভাব আছে, তাহা দূর করিয়া সকলকেই উন্নত ও সুসভ্য করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন আর শ্রেণীবিশেষের কোন গুরুত্ব নাই, সংখ্যার গুরু-লঘুত্ব বা মেজরিটি মাইনরিটিরও কোন সমস্যা নাই। মেজরিটিই হউক, মাইনরিটিই হউক—সকলেরই অধিকার ও দাবী এখন সমান—সকলেরই স্বার্থ এখন নিরাপদ।

রাশিয়ায় মোট ১০৮টি জাতি ও উপজাতি বাস করে। ইহাদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কার ও আচার-ব্যবহার বিভিন্ন। এই এতগুলি জাতির কাহাকেও জোর করিয়া পরের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রত্যেকেই নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া নিজের শিক্ষালাভ করিতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের স্বাধীনতা আইন দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে।

রাশিয়ায় এখন জমিদারী-প্রথা বা জায়গীরদারী প্রথা নাই। ব্যক্তিগতভাবে এখন সেখানে কেহই জমাজমি বা টাকাকড়ি রাখিতে পারে না। সমস্ত সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত (১) অধিকার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের জাতীয় আয়, উৎপন্ন দ্রব্য বা কলকারখানা-এখন স্টেটের অধীন, স্টেটই সব-কিছুর মালিক। প্রত্যেক নাগরিক স্টেটের জন্য কাজ করে, তার বিনিময়ে স্টেটই তাহার ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার বিধান করে। টাকা না জমাইলে বা জমা-জমি না রাখিলে ভবিষ্যতে আমার ছেলেমেয়ের কি দশা ঘটিবে এ প্রশ্ন লইয়া আর এখন কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না।

(১) বর্তমানে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। খানিকটা সম্পত্তি এবং অর্থ এখন ব্যক্তিগত অধিকারে রাখা যায়।

ষ্টেটই সকলের মা-বাপ, ষ্টেটই সকলের সাধারণ ধনাগার। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য—সকলই এখন ষ্টেট-নিয়ন্ত্রিত।

পূর্বে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাকেও মিল ও খনিতে কাজ করিতে হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথা এখন রহিত হইয়াছে। অতিলাভের লোভে অনেকে শ্রমিকদিগকে উপরি সময় (extra time) খাটাইত; সে প্রথাও এখন নাই। রাশিয়ানদের জীবন ও কর্ম এখন সুনিয়ন্ত্রিত। শ্রমিকই হউক, কৃষকই হউক, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া কাহাকেও মরিতে হয় না। প্রত্যেকের জীবনেই বিশ্রাম ও আনন্দের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অলস নিষ্কর্মা লইয়া কাহারও বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। প্রত্যেক রাশিয়ানকেই তাহার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিতে হয়—ইহাই ষ্টেটের বিধান।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বালক বালিকাদিগের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষার (Physical Education) জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত আছে। ষ্টেট হইতেই সর্বত্র স্কুল-কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে, সেখানে সকলকেই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দান করা হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়া এক অদ্ভুত নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ধর্মকে সে ষ্টেট হইতে একদম পৃথক রাখিয়াছে। ষ্টেট হইতে কাহাকেও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না বা কোন ধর্মমন্দিরকেও কোন সাহায্য করা হয় না। সোভিয়েট রাশিয়া পুরাতন অনেক কিছুই তুলিয়া দিয়াছে, তার মধ্যে ধর্মই হইতেছে প্রধান। ধর্মকে কমিউনিষ্টরা 'জাতির পক্ষে আফিম' (Opium of the people) বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। কমিউনিষ্ট সমাজের আদর্শ হইতেছে ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ (Godless, Religionless and Classless Society) গঠন করা। মার্কস যখন এই আদর্শ প্রচার করেন তখন ইউরোপে ধর্মের নামে বহু অনাচার ঢুকিয়াছিল। পাদ্রীদের

তখন খুবই প্রাধান্য ছিল; অনেক বিষয়ে ষ্টেটের (State) উপর গীর্জার (Church) আধিপত্য ছিল। গীর্জাকে অতিক্রম করিয়া ষ্টেট অনেক সময়েই কাজ করিতে পারিত না। এই কারনে রাজারা সব সময়েই পাদ্রীদিগকে হাতে রাখিত। সমাজে যখনই কোন জনজাগরণের বা বিপ্লবের চেষ্টা হইয়াছে, তখনই রাজশক্তি পাদ্রী ও পুরোহিতদিগের সহায়তায় তাহা দমন করিয়া দিয়াছে। এই সব লক্ষ্য করিয়া মার্কস্ ধর্মকে একদম উঠাইয়া দেন। তিনি মনে করেন, ধর্মই যত অনিষ্টের মূল, সুতরাং দাও ইহাকে কবর। বলা বাহুল্য, লেনিনও সেই মতাবলম্বী ছিলেন; তিনিও ধর্ম ও নীতিকে আদৌ কোন আমল দেন নাই।

নারীজাতিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা, শিল্প, দেশসেবা—সর্বত্রই নারীর প্রবেশাধিকার আছে। নারীর মর্যাদাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। সন্তানলক্ষণা এবং নবপ্রসূতি উভয়কেই যথারীতি সাহায্যদান ও পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে। সন্তান-পালন-সম্বন্ধে তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিশুদিগের প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া অত্যন্ত যত্নশীল। শিশুদিগের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য বিচক্ষণ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে ষ্টেট হইতে প্রস্তুত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হয়। শিশুদিগের লালন-পালন, চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্বন্ধেও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। রাশিয়ানরা শিশুদিগকে দেশের অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করে। "Our children—the hope of the future"—ইহাই তাহাদের নীতি। সর্বশ্রেণীর শিশুকেই এই আলোকে দেখা হয়। জার-আমলে কেবলমাত্র বড়লোক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদিগেরই শিক্ষা ও লালন-পালনের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরা যাহাতে কোনরূপে শিক্ষা না পায়, ইহাই ছিল জারের মতলব। জারের শিক্ষানীতি কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার নিয়োজিত শিক্ষামন্ত্রীর রিপোর্ট হইতেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে:

"To teach the mass of the children or even the majority of them how to read will bring more harm than good."

অর্থাৎ ঃ—সর্ব সাধারণের ছেলেমেয়েকে, অথবা তাহাদের অধিকাংশকে লেখাপড়া শিখাইলে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই হইবে বেশী।

শিক্ষা-মন্দিরে অস্পৃশ্যতা দোষও ছিল প্রবল। শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়িবে, সেখানে অশিক্ষিত নীচজাতীয় ছেলেমেয়েরা যাহাতে না পড়িতে পারে, ইহাই ছিল জারতন্ত্রের বিধান ঃ "Children of the wealthy class should be protected from an influx into the schools children of the poor and middle classes."

অর্থাৎ ঃ—বড়লোকদের ছেলে-মেয়েরা যে স্কুলে পড়িবে, সেখানে গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা যাহাতে না ঢুকিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু সোভিয়েট-শাসনে এই নীতিকে সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাকথিত ছোটলোক এবং অস্পৃশ্যদের ছেলে-মেয়েদিগকে তুল্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের কাছে বড়লোক বা অভিজাত সম্প্রদায়ই যখন নাই, তখন ছোটলোকের কোন প্রশ্নও আর নাই। মানুষ হিসাবে এখন প্রত্যেককে একই আলোকে দেখা হইতেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, কৃষি-বাণিজ্য-যা-কিছু উন্নতিই এখন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট করিতেছে, তার সকলের পিছনেই আছে সমগ্র দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ, সুখ-সুবিধা ও জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিবার পরিকল্পনা।

কমিউনিজ্‌মের স্বাভাবিকতা

কমিউনিজ্‌ম স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক? মানুষের বাস্তব জীবনের সহিত ইহার কোন সুসঙ্গতি আছে, না-কি এ একটা সম্পূর্ণ আজগুবী নূতন-কিছু? এইবার আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কমিউনিজমকে একেবারে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহার নীতি ও নির্দেশকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানিয়া চলি। কমিউনিজ্‌মের মূলমন্ত্র হইল: ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে বিসর্জন দিয়া সবার মাঝারে একজন হইয়া জীবনকে উপভোগ করা। কমিউনিজম আমাদিগকে তাই আত্মকেন্দ্রিক না করিয়া সমাজকেন্দ্রিক করিতে চায়; আমাদের চিন্তা ও কর্মকে অন্তর্মুখীন না করিয়া বহির্মুখীন করিতে চায়। এই নীতি কি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক বা নাগরিক জীবনে আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানিয়া চলি না?

ধরুন একটা একান্নবর্তী পরিবার। স্বামী, স্ত্রী, দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে, একটি চাকর, একটি চাকরাণী। বাপ এবং বড় ছেলে রোজগার করে; ছোট ছেলে এবং একটি মেয়ে স্কুলে পড়ে। বড় ছেলেটি তাহার যাবতীয় উপার্জন আনিয়া বাপের হাতে দেয়; বাপ কর্তা হইয়া সেই পরিবারকে চালনা করে। প্রতিদিন এক হাঁড়িতেই সকলের জন্য রান্না হয়, তারপর যার যতটুকু প্রয়োজন, বা যে যাহা খাইতে চায়, তাহাকে তাই খাইতে দেওয়া হয়। যার যখন কাপড়-জামার দরকার, যার যখন চিকিৎসার দরকার, সমস্তই সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে যায়। কে কত টাকা রোজগার করে, কে কতটুকু কাজ করে সে হিসাব করিয়া বন্টন করা হয় না; প্রত্যেকের অভাবের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা হয়। এইখানে বলা যাইতে পারে: এই পরিবারে

কমিউনিজম আসিয়াছে। কিন্তু আবার এই পরিবারেই যদি প্রত্যেকে রোজগার করিয়া নিজের নিজের খোরপোষের ব্যবস্থা করে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ গোপনে গোপনে সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে, তবে আর সেখানে কমিউনিজ্‌ম থাকে না ; সেখানে আসে পুঁজিবাদের মনোবৃত্তি।

ঠিক এই প্রকারে সমস্ত দেশকে যদি একটা বিরাট পরিবার মনে করা যায় এবং দেশবাসীর সকলেই যদি তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজকর্ম করিয়া নিজেদের উপার্জন একটা সাধারণ ভাণ্ডারে রাখিয়া যখন যাহার যেরূপ প্রয়োজন, ততটুকুই লয়, তবেই সেখানে সত্যিকার কমিউনিজম আসে।

নাগরিক জীবনেও আমরা এইরূপে আংশিকভাবে কমিউনিজমকে স্বীকার করি। আমরা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেই। সকলেই একরূপ দেই না ; কেউ বেশী দেই, কেউ কম দেই। এই সব ট্যাক্স একত্র করিয়া কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহ করে, রাস্তা তৈরী করে, রাস্তায় আলো দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ট্যাক্সের কম বেশী থাকিলেও প্রত্যেক নাগরিক যদৃচ্ছাক্রমে সেই রাস্তা দিয়া চলে, সেই পানি, সেই আলো সমানভাবে উপভোগ করে। একথা কেহ বলিতে পারে না ; আমি অমুক রাস্তা দিয়া কোনদিন যাইবও না, ট্যাক্সও দিব না ; অথবা কে কত ট্যাক্স দেয় সেই হিসাব করিয়াও তাহাকে ঐ সব সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। ট্যাক্স না দিলেও অথবা কম দিলেও, রাস্তার আলো ও পানি যার যত খুশী ভোগ করিতে পারে। এখানেও আমরা দেখি কমিউনিজ্‌ম। পথ-ঘাট, নদ-নদী, আলো-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য—প্রত্যেকটিই কমিউনিজমের দৃষ্টান্ত। অফুরন্ত সূর্যা-লোক ছড়ান রহিয়াছে, যার যত দরকার লও ; নদীভরা পানি আছে, যার যত খুশী ব্যবহার কর।

এইরূপে চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ন রেট, এডুকেশন সেস, রোড সেস ইত্যাদিকেও কমিউনিজমের দৃষ্টান্ত বলা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ধন ও সম্পত্তির উপার্জন ও বন্টন-ব্যবস্থার উপরেই কমিউনিজ্‌ম নির্ভর করিতেছে। অপরকে বঞ্চিত করিয়া আত্মসুখের জন্য দেশের জনসম্পদ নিজ হাতে মজুদ করিয়া ভোগ করিতে গেলে হয় পুঁজিবাদ, আর সবার সঙ্গে তাহা ভোগ করিতে গেলে হয় কমিউনিজম। ধন-সম্পদের উৎপত্তি ও বিতরণ (Production and Distribution) লইয়াই যত গণ্ডগোল। উৎপত্তির উপায় একচেটিয়া ভাবে কাহারও হাতে থাকিলে চলিবে না, আবার বিতরণের ব্যবস্থাও সমান রাখিতে হইবে ; তারতম্য করিতে গেলেই মুশকিল। উৎপন্নের ব্যবস্থা ও আয়ের বিতরণ—উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। যাহার যেরূপ খুশী উৎপন্ন করিবে এবং যেরূপ খুশী বিতরণ করিবে, ইহা চলিবে না। ইহার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি চাই।

ধন-সম্পদের বিতরণ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। দেখা যাউক, কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় ঃ

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, আটটি নীতির উপরে দেশের ধন-সম্পত্তি বিতরণ করা যাইতে পারে ঃ

(১) To each what he produces ঃ—অর্থাৎ যে যাহা উৎপন্ন করে, সে তাহাই পাইবে।

(২) To each what he deserves ঃ—অর্থাৎ যাহার যোগ্যতা যেরূপ, সে সেইরূপ পাইবে।

(৩) To each what he can grab ঃ—অর্থাৎ যে যেরূপ-ভাবে যাহা হাত করিতে পারে, সে তাহাই পাইবে।

(৪) The plan of the few rich and many poor ঃ—অর্থাৎ অল্প সংখ্যককে বড়লোক হইতে দিয়া বাদবাকী সকলকেই গরীব রাখিতে হইবে।

(৫) To each what he wants ঃ—অর্থাৎ যাহার যেরূপ দরকার, সে তাহাই পাইবে।

(৬) Distribution by Class :—অর্থাৎ শ্রেণী-বিভাগ করিয়া অগ্রে প্রত্যেক শ্রেণীর হার নির্দিষ্ট করিতে হইবে, পরে সেই নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রত্যেককে দিতে হইবে।

(৭) Laissez fair :—অর্থাৎ যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেই-রূপ চলিবে।

(৮) To give everybody an equal share :—অর্থাৎ ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান ভাগ দিতে হইবে।

এই আটটি নীতির কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, সেই বিচার করা যাউক :

(১)

যে যাহা উপার্জন করে, সে তাহাই পাইবে—এই নীতি শুনিতে ভাল, কিন্তু কাজে লাগানো কঠিন। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেককেই খাটিয়া খাইতে হইবে, কারণ যে খাটিবে না, সে কিছুই পাইবে না। ইহা দ্বারা অলসতা দূর হইবে, দেশের কর্মশক্তি বাড়িবে এবং প্রত্যেক লোক স্বাবলম্বী হইতে শিখিবে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে, কে যে কতখানি কাজ করিল, তাহা ঠিকভাবে বুঝিব কেমন করিয়া? ধরুন একজন গৃহস্থ জন-মজুর খাটাইয়া জমিতে ধান উৎপন্ন করিল। গরু, লাঙ্গল, বীজধান—সবই গৃহস্থের, শুধু পরিশ্রম মজুরদের। অবশ্য গৃহস্থ নিজেও তত্ত্বাবধান করিতে ভুলে নাই। এখন উৎপন্ন ধান্যের বিতরণ কিরূপ হইবে? কে কতখানি উৎপন্ন করিল, কে বলিয়া দিবে? অথবা মনে করুন, কোন কাপড়ের কলে (mill) কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কাপড় প্রস্তুত হইয়া গেলে সেই কাপড় বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা আসিল। এখন সেই টাকার বিতরণ কিরূপে করা যাইবে? কেহ মেশিন চালাইয়াছে, কেহ সূতায় রং দিয়াছে, কেহ সূতা কাটিয়াছে, কেহ তুলা বহন করিয়া আনিয়াছে, কেহ সেই তুলা উৎপন্ন করিয়াছে—ইত্যাদিভাবে বহু হাত ঘুরিয়া আসিয়া তবে

কাপড় তৈরী হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মিলের মালিক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে মেশিন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম আনিয়াছে, কারখানা তৈরী করিয়াছে, মেশিন বসাইয়াছে, লোকজন খাটাইয়াছে, তবে না মেশিনটি চালু হইয়াছে। এখন এই উৎপন্ন আয়ে কার কত-টুকু অংশ? কে কম পাইবে, কে বেশী পাইবে? কারো দানই ত তুচ্ছ নয়। কোন্ নীতি অনুসারে অংশ-নির্ধারণ হইবে? কেহই এ প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে পারিবে না।

কেহ হয়ত বলিবেন : সময়ের নিক্তিতে প্রত্যেককে পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা করা যায়, অর্থাৎ যে যত সময় কাজ করিবে, তত পরি-মাণ নিতে হইবে। ধরুন ঘন্টা প্রতি প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দেওয়া হইবে সাব্যস্ত হইল। এখন যে ব্যক্তি দুই ঘন্টা কাজ করিল, তাহাকে দুই টাকা দিলাম, যে আধঘন্টা কাজ করিল, তাহাকে আট-আনা দিলাম। কিন্তু এ নীতিও অচল। সময় দেখিয়া সব কাজের মূল্য নিরূপণ করা যায় না। সব কাজ এক রকম নয়, সব লোকও এক রকম নয়। কাজের এবং লোকের তারতম্য আছে। কোন ডাক্তারের ৩ টাকা ফি, কোন ডাক্তারের বা ১৬ টাকা ফি; কোন ব্যারিষ্টারকে দৈনিক ১৬ টাকা দিলেই তিনি খুশী হন, আবার কোন ব্যারিষ্টারকে দৈনিক ৫০০ টাকা দিয়াও পাওয়া যায় না। শ্রমিকদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। একজন রাজমিস্ত্রী এবং একজন যোগাড়ের একই মূল্য নয়। অথবা সব রাজমিস্ত্রীও সমান যোগ্য নয়। চাহিদা (demand) এবং সরবরাহ (supply)-এর উপরেও মজুরীর তারতম্য ঘটিয়া যায়। যেখানে ডাক্তার কম এবং রোগী বেশী সেখানে অনুপ-যুক্ত ডাক্তারকেও বেশী ভিজিট দিতে হয়। আবার যেখানে রোগী কম কিন্তু ডাক্তার বেশী, সেখানে ভাল ডাক্তারকেও কম ভিজিট লইতে হয়। আবার একই স্থানে অনেকগুলি অভিজ্ঞ লোক জড় হইলে তাহা-দের মূল্যও কমিয়া যায়। পছন্দ-অপছন্দ ও আচার-ব্যবহারের প্রশ্নও

এ সমস্যাকে কম জটিল করিয়া তুলে না। সিনেমাতে যাহারা অভিনয় করে, তাহাদের সকলেরই মূল্য এক নয়। কোন সুন্দরী তরুণী তারকা বয়স্কা কোন অভিজ্ঞ অভিনেত্রী অপেক্ষা ঢের বেশী টাকা পায়। সময়ের উপর তাই আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে না। চব্বিশ ঘন্টায় কেউ এক টাকা উপার্জন করিতে পারে না; আবার এক ঘন্টায় কেউ হাজার টাকা উপার্জন করে।

যাহারা কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য আবার স্বতন্ত্র ধরনের। সময়ের নিক্তিতে তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব।

নারীরা সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করে, ঘর-সংসার করে, তাহাদিগকে ঘন্টা হিসাবে মূল্য দিতে গেলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে না-কি?

বৃদ্ধ, অক্ষম, দুর্বল ও শিশুদের অবস্থাই বা কী হইবে! তাহারা ত উপার্জন করিতে অসমর্থ। তাহারা কি তবে কিছুই খাইতে পাইবে না?

এই ধরনের বহু ফ্যাকড়াই এই নীতিকে অচল করিয়া দেয়।

(২)

যে যেরূপ যোগ্য সে সেইরূপ পাইবে—এই নীতিও কার্যতঃ অচল। আপাততঃ দেখিয়া মনে হয় বটে যে, এই নীতি অনুসারে অর্থ-বন্টন হওয়াই উচিত, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় না। যাহারা মেধাবী, সচ্চরিত্র, অধ্যবসায়ী, মিতব্যয়ী ও উদ্যমশীল, তাহারা যদি বড়লোক হইত এবং যাহারা অলস, দুশ্চরিত্র, অমিতব্যয়ী বা জুয়াচোর, তাহারা যদি দরিদ্র হইত, তবে বলিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তাহা হয় কি? অধিকাংশ স্থলেই এই নীতির অমর্যাদা দেখিতে পাই না-কি? লম্পট ও ধড়িবাজ লোকেরাই অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করিতেছে, আর সাধু ব্যক্তিরা পচিয়া মরিতেছে।

যোগ্যতার মাপকাঠি কি হইবে, তাহাও স্থির করা কঠিন। নীতির দিক দিয়া যাহাকে যোগ্য বলা যায়, কর্মের দিক দিয়া হয়ত সে যোগ্য নয়; আবার নীতির দিক দিয়া যে অযোগ্য, রাজনীতির দিক দিয়া হয়ত সে সম্পূর্ণ যোগ্য। কেমন করিয়া তবে যোগ্য-অযোগ্য বিচার হইবে? কোন যোগ্যতাকে আমরা গ্রহণ করিব? নীতির যোগ্যতা, না দুর্নীতির যোগ্যতা?

যোগ্যতার মানদণ্ড যদি নিরূপিত হয়, তবে এই নীতি অনুসারে ধন-বন্টন করিলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা হয় না। ধরুন একটি বড় ঘরের ছেলে আর একটি মজুরের ছেলে। বড় লোকটির ছেলে এম. এ. পাশ করিল, মজুরের ছেলেটি অর্থাভাবে ম্যাট্রিকও পাশ করিতে পারিল না। ইহাদের মধ্যে যোগ্য কে? নিশ্চয়ই বলিবেন, এম. এ. পাশ ছেলেটি। কিন্তু কেন? যে ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারিল না, তার অযোগ্যতাই বা কী? বড় ঘরের ছেলেটি পূর্ব হইতেই উন্নত পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া সর্বপ্রকারের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়াছে, কাজেই সে এম. এ. পাস করিতে পারিয়াছে। অনুরূপ সুযোগ ও সুবিধা পাইলে মজুরের ছেলেটিও যে এম. এ. পাশ করিতে পারিত না তাহা কে বলিল? কাজেই যাহারা আজ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহারা যে সত্যই যোগ্য আর যাহারা অযোগ্য বিবেচিত হইতেছে, তাহারা যে সত্যই অযোগ্য, তাহা ত নয়।

তারপর যোগ্যতার ক্রম-নির্ধারণ করাও এক দুরূহ ব্যাপার। মেথর, কৃষক, কর্মকার, শিক্ষক, পুরোহিত, মোল্লা, মৌলবী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সওদাগর, ইঞ্জিনিয়ার—কার চেয়ে কে বড়? কার চেয়ে কে যোগ্য বলুন ত? কৃষক জমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে, সে লেখাপড়া জানে না; আর জজসাহেব লেখাপড়া জানেন, বিচার করেন, উহাতেই কৃষক অপেক্ষা জজসাহেব কেন বড় হইবেন? কৃষক যেমন লেখাপড়া জানে না, তেমনি জজসাহেবও

ত জমি চাষ করিতে জানেন না। জজসাহেব কৃষক অপেক্ষা নিজেকে উন্নততর মনে করিতে পারেন, কিন্তু কৃষকের উৎপন্ন ধান্যশস্য না হইলে জজসাহেবের একদিনও চলে না। কৃষক না হইলে সমাজ চলে কি? সেইরূপ মেথর, কুলি, মজুর ইত্যাদি না থাকিলে বড় বড় বাবুদের কি দশা হয়, ভাবুন তো? কাজেই বলিতে হয়, যোগ্যতার কোন ধ্রুব আদর্শ নাই। এক হিসাবে প্রত্যেকেই যোগ্য, প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে। পরস্পরের আদান-প্রদানের উপরেই আমাদের সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কোন ছোট-বড় প্রশ্ন নাই; প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে আর আল্লার চোখে সবাই সমান।

অতএব যোগ্যতার মাপকাঠিতে ধন-বন্টন সম্ভব নয়।

(৩)

তৃতীয় উপায়ও (অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবে পারে লউক) গ্রহণযোগ্য নয়। ইহা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিরই অনুরূপ। এই নীতিই ত বর্তমান জগতে অনুসৃত হইতেছে এবং ইহার ফলেই ত দুনিয়ায় যত মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি। ইহার প্রতিকার-কল্পেই ত কমিউনিজমের প্রবর্তন। দুনিয়ার সব লোকই যদি সমান বলবান হইত, অথবা সমান সুবিধা পাইত, তাহা হইলেও না হয় এ নীতি খাটিত। কিন্তু তাহা ত নয়! কাজেই জোর যার মুল্লুক তার নীতি চলিলে সবলেরাই প্রবল হইবে, দুর্বল মারা যাইবে। পক্ষান্তরে কাড়াকাড়ির ফলে একটা ভীষণ অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

(৪)

চতুর্থ নীতি হইল: সাধারণ লোককে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের উপরে দুই-চারজনকে বড়লোক হইতে দেওয়া। বর্তমানেও এই নীতি চলিতেছে। মুষ্টিমেয় লোক-শিক্ষায়, জ্ঞান-

বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় পারদর্শী হইয়া সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে আর অধিকাংশ লোক দুঃখে-কষ্টে দিন কাটাইতেছে। মুষ্টিমেয় বড়লোকদেরই জমিদারী, বাড়ি, গাড়ী—সব কিছু। বহুকে বঞ্চিত করিয়া অল্প লোকের এই সুখভোগ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ইহাতে দেশের অকল্যাণ হয়। একটা অভিজাত সম্প্রদায় আপনা আপনি গড়িয়া উঠে, তাহারা হয় ভিষণ আত্মাভিমানী, জনসাধারণকে তাহারা ঘৃণা করিতে শিখে, দেশের নাড়ীর সহিত তাহাদের প্রায়ই যোগ থাকে না। দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ তাহারা বুঝে না, আপন স্বার্থের জন্য তাহারা গরীবকে গরীবই রাখিতে চায়, কোনরূপ সুখ-সুবিধা তাহাদিগকে দিতে চায় না, বরং নানাভাবে তাহাদিগকে বঞ্চিত করে।

এইরূপ একশ্রেণীর লোককে বড়লোক হইতে দেওয়া রাজনৈতিক কারণেও যুক্তিসঙ্গত নয়। যে কোন বিপ্লবের সময় তাহারাই করে বাধার সৃষ্টি এবং অনেক উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেয়।

(৫)

পঞ্চম উপায় হইতেছে: যাহার যেরূপ অভাব, সেইরূপ বন্টন ব্যবস্থা করা। কিন্তু এখানেও ঐ একই বিভ্রাট। কার কিরূপ অভাব, তাহা কে ঠিক করিয়া দিবে? অভাবের কোন মানদণ্ড নাই। আমার যাহা অভাব, অপরের তাহা বিলাস। আমার সরু চালের ভাত দরকার, কিন্তু একজন কুলি সে-ভাত খাইয়া খুশী হইবে না, সে চায় মোটা ভাত। একই পরিবারে একজন রাতে রুটি খায়, একজন ভাত খায়; একজন মিষ্টি চায়, একজন আদৌ চায় না। এইরূপ অসংখ্য ব্যক্তিগত অভাব বা প্রয়োজন দুনিয়ায় আছে। বাহির হইতে কে সেই অভাবের পরিমাপ করিবে? অভাব অনেকখানি ব্যক্তিগত অনুভূতি, অনেকখানি অন্তরের জিনিস। বাহির হইতে ইহার বরাদ্দ করিতে গেলে কিছুতেই তাহা মিল খাইবে না, একটা গোঁজামিলেরই সৃষ্টি

হইবে। কেহ সন্তুষ্ট হইবে, কেহ হইবে না। ফলে যে অশান্তি সেই অশান্তিই রহিয়া যাইবে।

(৬)

শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বন্টন করিতে গেলেও বিপদ আছে। কুলি, মজুর, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, কৃষক, সওদাগর, মোল্লা, মৌলভী, পুরোহিত, শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট—ইত্যাদি ভাবে না হয় শ্রেণী-নির্ণয় করা গেল। কিন্তু কোন শ্রেণীকে কত দেওয়া হইবে— কে তাহা সাব্যস্ত করিবে? কাহার চেয়ে কে বড়? কাহার চেয়ে কে বেশী পাইবে? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা কিছুতেই হইতে পারে না। তাছাড়া এরূপভাবে ভাগ করিতে গেলে সমাজ শতধা-বিভক্ত হইয়া যাইবে। এবং পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসা অত্যধিক রূপে বাড়িয়া যাইবে। কাজেই এ নীতি অগ্রাহ্য।

(৭)

যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ চলুক—এ নীতিও যুক্তিযুক্ত নয়। ইচ্ছা করিলেই সব সময়ে সব কাজ হয় না। আমি ইচ্ছা করিলাম যে, যেরূপ চলিতেছে সেইরূপই চলুক, কিন্তু দুনিয়া সেভাবে চলে না। ঘটনা প্রবাহ কাহারও কথা মানে না, সে তার নিজের পথ কাটিয়া চলে। কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকার নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। সময় মত হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে কোন ঘটনার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু সুযোগ ছাড়িয়া দিলে স্বভাবের টানে ঘটনা-প্রবাহ এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, তখন আর কোন-কিছু করা সম্ভব হয় না। জগতের কোন জিনিসই একভাবে পড়িয়া থাকে না, একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ই হয়। কাজেই চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই যে ঝঞ্ঝাট এড়ান যায়, এমন নয়। ঘরের দাওয়ায় বিড়াল

ঘুমাইতেছে দেখিয়া গৃহিণী যদি মনে করেন যে, ও যেমন আছে তেমনি থাকিবে, আমি একটু পাড়া বেড়াইয়া আসি—এই বলিয়া রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া রাখিয়াই যদি তিনি পাড়া বেড়াইতে যান, তবে তাহাকে পস্তাইতে হইবে। এক ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিবেন, বিড়ালও ঘুমাইয়া নাই, রান্নাঘরের দুধটুকুও নাই।

(৮)

উপরে যে সাতটি নীতির কথা আলোচনা করা হইল, আমরা দেখিলাম, তাহার একটিও সন্তোষজনকভাবে ধনবন্টন-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। একটিমাত্র উপায়ই এখন আমাদের বাকী আছে সেটি হইতেছে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম। কমিউনিজম বলে: উপরের কোন নীতিই যখন পুরাপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন ধন-সম্পদকে সকল মানুষের মধ্যে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়াই উচিত। কোনরূপ তারতম্য করা যখন সম্ভবপর নয়, অথবা করি-লেও যখন অবিচার দূর হয় না তখন সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা হইতেছে প্রত্যেককে সমান অংশ দান করা। ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন —সকলেরই অধিকার সমান, কাহারও চেয়ে কেহ বড় নয়, কাহারও চেয়ে কেহ ছোট নয়—এই নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও অনেক-কিছু বলিবার আছে। আমরা যথাস্থানে সে কথা বলিব।

কমিউনিজ্‌মের দার্শনিকতা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

কমিউনিজমের পৃষ্ঠপটে কোন দার্শনিকতা আছে কি ? না, ইহা কেবলই একটা নিছক স্বপ্ন-বিলাস ?

শুনিলে আশ্চর্য লাগে, এমন একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপারের পিছনেও আছে একটা মস্তবড় দার্শনিক মতবাদ। Dialectic Materialism অর্থাৎ 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'-ই হইতেছে সেই পশ্চাদ্ভূমি। এই দার্শনিক পটভূমির উপরই কমিউনিজমের বিরাট সৌধ দাঁড়াইয়া আছে।

বলা বাহুল্য, কার্ল মার্কস্‌ই এই নব দার্শনিক মতবাদের জন্মদাতা।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কী ?

পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা একটুও জ্ঞান রাখেন, যাঁহারাই জানেন, এই বিশ্বপ্রকৃতির মূলে যে জড় ও চৈতন্যের নানা রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মোটামুটি-ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; যাঁহারা চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী (Idealists) আর যাঁহারা জড়কে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহারা জড়বাদী বা বস্তুবাদী (Materialists)। ভাববাদীরা বলেন ঃ এই বস্তু-জগতের কোন প্রকৃত সত্তা নাই, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত আর একটা অশরীরী ভাব-জগৎ আছে ; বস্তুজগৎ তাহারই রূপান্তর মাত্র ; অর্থাৎ ঃ যাহা কিছু আমরা বস্তুজগতে ঘটিতে দেখি, তাহা পূর্বেই আমাদের মনোজগতে ঘটে। আমাদের মনে যে-সব চৈতন্য-চিত্র খেলা করে, তাহাই বাহিরের জগতে রূপ পায়। কাজেই বিশ্বজগতের সমস্ত ঘটনারই মূল কারণও সত্যরূপ থাকে আমাদের মনে। বাহিরের জগতের কোথাও কোন বিপর্যয় দেখিলে ভাবিতে হইবে, এই বিপর্যয় পূর্বেই আমাদের মনে আসিয়াছে। এক কথায় ঃ Idea-ই হইতেছে সত্য বস্তু ; Matter

তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। কোন সুদূর হইতে Idea-র লীলাখেলা বিশ্ব-প্রকৃতির চিত্রপটে ছায়া ফেলিতেছে, তাহারই ফলে এই দৃশ্য-জগৎ আমাদের নয়নকোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা শুধু ছায়াচিত্রই দেখিতেছি, আসল বস্তু দেখিতেছি না। আসল বস্তুটি যে কি (what is the thing-in-itself) তাহা আমরা জানি না, বস্তুর আসল সত্তা অজ্ঞেয়। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত আছে সেই ধ্রুবলোক (world of noumena), কাজেই বস্তুজগৎ মায়াময়, মিথ্যা, আর ধ্যান-জগৎই একমাত্র সত্য।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট (Kant) ছিলেন এই মতাবলম্বী। Idea বা ভাবকেই তিনি মুখ্য বলিয়া মনে করিতেন, বস্তুকে দিতেন গৌণ স্থান। এই জন্যই তাহার দর্শনকে আধ্যাত্মবাদ অথবা Idealism বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হেগেল এই মতকে আরও পরিবর্ধিত করিয়া বলেন যে, আমাদের জ্ঞান জন্মে দ্বন্দ্বমূলক ধারণা হইতে। সমস্ত ধারণাই দ্বন্দ্বমূলক, অর্থাৎ কোন একটি ধারণার মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধ ধারণাটিও নিহিত থাকে। এ পরস্পর বিরোধী ধারণার মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে এবং তাহার ফলে আর একটি নবতর ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। বাস্তব জগতেও সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চলিতেছে। এই পরিবর্ধনের ধারা উর্ধমুখী (from the lower to the higher)। ইহার ফলে আমাদের জ্ঞানের সীমানা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পরিবর্তনের পদ্ধতিও খুব জটিল। এক একটি ধারণা বহু বিচিত্র ধারণার সহিত বিজড়িত। কোন ধারণাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নাই। কাজেই কোন একটি বিষয়ে, ধারণা করিতে গেলে, তার সঙ্গে অনেক পারিপার্শ্বিক ধারণাও জড়াইয়া যায়। ধারণায় ধারণায় দ্বন্দ্ব লাগে, আবার একটি বৃহত্তম ধারণার মধ্যে সেই দ্বন্দ্বগুলি মিলাইয়া যায়। ধরুন আপনার ড্রইংরুমের

একখানি চেয়ার। চেয়ার বলিলেই টেবিল, ল্যাম্প, আলমারী ইত্যাদি অ-চেয়ার বস্তুগুলির সহিত একটা দ্বন্দ্বের ভাব মনে জাগে। চেয়ার যাহা টেবিল তাহা নয়। কিন্তু যদি বলি আসবাবপত্র, তবে চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদি সবগুলিকেই বুঝান যায়। ধারণায়-ধারণায় এই যে বিরোধ ও সংঘর্ষ এবং পরে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, ইহাকে বলা হইয়াছে "Dialectic Process" বা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি। শব্দটি গ্রীক দর্শন হইতে আসিয়াছে, উহার ধাতুগত অর্থ হইল প্রশ্নোত্তরে কথোপকথন (Dialogue)। বিখ্যাত গ্রীক্‌ দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিস এই পদ্ধতিতেই তর্ক করিতেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয়টির অন্তর্নিহিত সঙ্গতি-অসঙ্গতিগুলি প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাহির করিয়া আনিতেন এবং পরে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিয়া দিতেন। হেগেল এই পদ্ধতিকেই গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ধারণাসমূহ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বস্তুজগতেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আসে। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। প্রত্যেক বস্তুর অন্তরেই আছে সংঘর্ষ ও রূপান্তরের বীজ। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আছে তাহার বিপরীত দিকে যাইবার একটা ঝোঁক (opposite tendency)। আমাদের বস্তু-জগতের পরিবর্তন ও বিকাশ আমাদের বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই বৈষম্য ও পরস্পরবিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেরই ফল।

কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রথম যে ধারণাটি জন্মে, তাহাকে বলা হয় "thesis' বা অঙ্গীকার; তাহার বিপরীত ধারণা-টিকে বলা হয় 'antithesis' বা অস্বীকার, আর উভয়ের সমন্বয়কে বলা হয় 'synthesis' বা সমন্বয়। প্রত্যেক বিষয়েই এইরূপ thesis, antithesis ও synthesis-এর ক্রিয়া চলিতেছে। দিন বলিলে রাতের ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে, কারণ রাতকে না বুঝিলে দিনকে বুঝা যায় না। এখন এই দুই বিরুদ্ধ ধারণাকে আর একটি

বৃহত্তর ধারণার মধ্যে আনিয়া মিলানো যায়; সেটি হইতেছে সময়। সময় বলিলে দিন ও রাত—দুইটিকেই বুঝায়। এখানে দিন হইল thesis, রাত হইল antithesis, আর সময় হইল synthesis.

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানবীয় ইতিহাসে যে-সমস্ত ঘটনা ও রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, অথবা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোন পরিবর্তন দেখা দিতেছে, হেগেলের মতে তাহার মূল কারণ রহিয়াছে আমাদের মনে বা ধারণায়। ধারণার ওলট-পালটের ফলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের ওলট-পালট দেখা দিতেছে। দুনিয়ার সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লব মানুষের চিন্তার পরিবর্তন বা বিকৃতিরই ফল। অন্য কথায় বস্তুজগৎ মনোজগতেরই একখানি প্রতিবিম্ব মাত্র।

হেগেল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই বলেন যে, জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। বিশ্বজগতে অবিশ্রাম ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলিতেছে, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ই হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য। প্রত্যেক বস্তুই তার বিপরীতের সহিত সংঘর্ষ করিয়া বাঁচিয়া আছে আর এই সংঘর্ষের ফলেই নবসৃষ্টি সম্ভব হইতেছে।

ইহাই হইল ভাববাদীদের কথা। পক্ষান্তরে জড়বাদীরা বলেন, ধারণা বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। বস্তুই আসল সত্য—ভাব নয়। বস্তু হইতেই ধারণা, ধারণা হইতে বস্তু নয়। অন্য কথায়ঃ আগে বস্তু, পরে ভাব। ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই, বস্তুই বর্ধিত বা উন্নত অবস্থায় চিন্তা বা মনন-শক্তি লাভ করে; বস্তু মনের সৃষ্টি নয়, মনই হইল বস্তুর সৃষ্টি; কাজেই এই দৃশ্যমান জগতের পিছনে যে অজ্ঞেয় কোন রহস্যলোক বা কোন ধারণা (Idea) থাকিতে পারে, জড়বাদী তাহা স্বীকার করেন না। এই বিশ্বজগতকে তাঁহারা প্রকাণ্ড একটা মেশিন বলিয়া মনে করেন। এমন কি মানুষও তাঁহাদের কাছে একটা মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই মানুষকে তাহারা বলেন—"Man the Machine"

জড়বাদীদের নিকট তাই ঈশ্বর বা ঐরূপ কোন অদৃশ্য বস্তুর কোন স্থান নাই। যে কোন ব্যাপারকেই যন্ত্র-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

মার্কস্‌ও ছিলেন এইরূপই একজন জড়বাদী। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য হেগেলেরই শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি হেগেল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মত প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মবাদ (Idealism) হইতে তিনি একেবারে জড়বাদে (Materialism) নামিয়া পড়েন। হেগেলের চিন্তাধারাকে তিনি সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দেন। তিনি বলেন, ধারণার ঘাত-প্রতিঘাতেই যে আমাদের বস্তু-জগতে ওলট-পালট ঘটে, তাহা নহে; বস্তুজগৎ আপন অন্তর্নিহিত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই নব নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে; তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমাদের মনে নানা ধারণার উদ্ভব হইতেছে; বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ওটা মনের খেয়াল মাত্র। বস্তুই সত্য, বস্তু ছাড়া কোন কিছুই সত্য নয়।

এই জড়বাদের সহিত মার্কস হেগেলের ডায়লেকটিক্ পদ্ধতি জুড়িয়া দিলেন। বলিলেন: জড়-জগতের সকল কিছুই ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতিতে সাধিত হইতেছে অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একা কোন ঘটনা ঘটিতেছে না। কোন ঘটনা বুঝিতে হইলে তাই তাহার পারিপার্শ্বিকতাকেও বুঝিতে হয়। বস্তু-জগতের সমস্ত কিছু পরস্পর নির্ভরশীল—প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী যে শক্তি আছে, তাহারই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে আমাদের এই বস্তু জগৎ বিকাশ লাভ করিতেছে। সংঘর্ষ তাই দোষের নয়, উহা নব নব সৃষ্টি ও বিকাশেরই পথ। যে-কোন ঘটনাই তার বিপরীতধর্মী বৈষম্যকে সঙ্গে করিয়া আনে। একটা-কিছু ঘটিলে বুঝিতে হইবে তার বিপরীতটিও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এই আত্মদ্বন্দ্বের ফলেই এক বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহল ও

যুদ্ধ-বিগ্রহ এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়েরই ইতিহাস। মার্কস আরও বলেন: মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ও পরিবর্তনও এই নিয়মের অধীন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই দেশে দেশে ইতিহাস রচিত হইতেছে। সমাজের ভাঙা-গড়া এই ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতিতেই চলিতেছে। সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে আছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বা জাতিতে জাতিতে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। ইহারই নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা Historical Materialism.

মার্কস তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' (Das Kapital)-এ এই সমস্ত সমস্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছেন। কিরূপ করিয়া একটি অবস্থা অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, বস্তুর মূল্য (value) কিরূপ করিয়া নির্ধারণ করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় তিনি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার সমাজতন্ত্রকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' (Scientific Socialism) বলা হয়।

ডায়ালেক্‌টিক্ জড়দর্শনে কোন আদর্শের বা নীতির বালাই নাই। ঘটনার স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যাও—যেখানে গিয়া লাগে লাগুক ইহাই হইল উহার ধর্ম। খাঁটি মার্কস্‌বাদী তাই কখনো ভুল করিতে ভয় পায় না।

মার্কস যখন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তখন এই ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি অনুসারেই তিনি দেখাইলেন যে, স্বভাবধর্মের তাগিদেই পুঁজিবাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কারণ উহার মধ্যেই উহার বিরুদ্ধধর্মী সাম্যবাদও নিহিত আছে। অন্য কথায়, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্যবাদে। কাজেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলে বিজয়লাভ সুনিশ্চিত। মার্কসের এই দর্শন কমিউনিস্টদের মনে তাই দিল এক বিপুল প্রেরণা, মার্কসের 'Capital' তাই হইল 'শ্রমিকদিগের বাইবেল' (the Bible of the labour class)।

অতএব আমরা দেখিলাম, কমিউনিজম শুধু একটা খেয়ালের সৃষ্টি নয়; এর পশ্চাতে আছে একটা দার্শনিক বুনিয়াদ, আর সেটি হইতেছে নিছক নিরীশ্বরমূলক জড়বাদ।

ইসলামের আলোতে কমিউনিজম

এতক্ষণ আমরা কমিউনিজ্‌ম সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই আশা করা যায়, পাঠক ইহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি ধারণা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে তাই আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। এইবার আমরা ইসলামের আলোকে ইহার দোষগুণ বিচার করিব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়: কমিউনিজমের মূলনীতিগুলি ইসলাম হইতেই গৃহীত। ইসলামই এই নূতন আন্দোলনের মূলে দিয়াছে প্রেরণা ও শক্তি। তবে জড়বাদী নাস্তিকদের হাতে পড়িয়া জিনিসটা যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বহুক্ষেত্রেই ইসলাম-অনু-মোদিত হয় নাই। একটি ভাল কাজ মন্দ উপায়ে করা হইয়াছে (Right thing done in a wrong way); এই জন্যই কমিউ-নিজমের সহিত ইসলামের সাদৃশ্যও যেমন আছে, পার্থক্যও ঠিক তেমনি আছে। আমরা একে একে সেইগুলিই পাঠককে দেখাইব।

ইসলামের সহিত কমিউনিজমের সাদৃশ্য

(১) সমাজতন্ত্র-স্থাপনে:—সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র স্থাপনই কমিউনিজ্‌মের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এত তোড়জোড়, এত বিপ্লব, এত রক্তপাত, এত দর্শন-বিজ্ঞান খাটাইয়াও পাশ্চাত্য জগৎ আজ যে-সাম্য আনিতে পারিতেছে না, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরবের মরু দুলাল মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সেই সাম্য শুধু মুখে প্রচার করিয়াই যান নাই, বাস্তবরূপেও তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান জাতির সমাজ-ব্যবস্থা সেই সাম্যনীতির উপরেই সুবিন্যস্ত। ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত ক্রিয়াকলাপই যে সমাজ-কেন্দ্রিক—এ কথা কে না জানে?

ইসলাম হইল সমাজ-রাষ্ট্রীক ধর্ম (Socio-political religion) অর্থাৎ এই ধর্মের সহিত সমাজ ও রাষ্ট্র ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। অন্য কোন ধর্মে এই বৈশিষ্ট্য নাই। রাষ্ট্র (State) হইতে ধর্ম (Church) সেখানে বিচ্ছিন্ন। কাজেই, অন্য সমাজের কাছে যে সমাজতন্ত্র হইয়া উঠে একটা সাধনার বস্তু, মুসলমানের কাছে তাহাই হয় তাহার সহজ স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম। কাজেই একথা অনায়াসেই বলা যায়, মুসলমান সমাজ যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলে এবং শরিয়ৎ মতে তার রাষ্ট্র ও সমাজ রচনা করে, তবে কমিউনিজম কোন দিনই সেখানে ঢুকিবার পথ পাইবে না।

মুসলমানের জীবনে চারিটি প্রধান ফরজ বা কর্তব্য কর্ম: নামাজ রোজা, হজ্ব ও জাকাৎ। এর প্রত্যেকটির ভিতরেই পাওয়া যায় মানু-ষের প্রতি মানুষের মমত্ব-বোধের পরিচয়। মুসলমান নামাজ পড়ে শুধু তার নিজের আত্মশুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য নয়,—সকল

মুসলমানের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ; তার প্রার্থনা ব্যক্তিগত নয়—জাতিগত। সকল মুসলমানের কল্যাণ সে কামনা করে। বাড়িতে নির্জন গৃহে একা-একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ পড়িলে তার বেশী সওয়াব হয়। নিশিভোরে নীরবে উঠিয়া সে নিজের নামাজটি সমাধা করিবার জন্যই ব্যগ্র হয় না, তন্দ্রাতুর অপর মুসলমান ভাইদিগকে সে উদার কণ্ঠে আহ্বান করে : এস, নামাজে এস, সফলতার দিকে এস ; নিদ্রা হইতে নামাজ শ্রেয়ঃ। এইরূপে পুণ্য ও কল্যাণকে তাহারা ভাগাভাগি করিয়া লয়। তার জমার নামাজ যতটা না আধ্যাত্মিক, ততটা সামাজিক ও রাজনৈতিক। নামাজের খোতবার মধ্যে অথবা নামাজ শেষে মসজিদে বসিয়াই সে নামাজ ও রাষ্ট্রের আলোচনা করে। তারপর আসে তার রোজা। এই মাসে বাদশা-গোলাম, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ—সকল মুসলমানই উপবাস করিতে বাধ্য। এই সময় তারা রোজা রাখে, একই সময় তারা রোজা খোলে। দুনিয়ার যে-কোন স্থানে যে-কোন মুসলমান থাকুক না কেন, এই পবিত্র মাসে সকলেই সাম্যের সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়। কোটিপতিকেও ভিখারীর অনশন-বেদনা আপন প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। এই যে দলগত ঐক্যবোধ বা 'আমরা' ভাব ('we' feeling)—ইহা মুসলমানের কাছে কোন স্বপ্নবিলাস নয়—ইহাই তাহার ধর্ম। তারপর আসে খুশীর ঈদ—মিলনের ঈদ। এই ঈদে প্রত্যেক মুসলমানকে মাথা-পিছু হিসাব করিয়া 'ফিৎরা' দিতে হয় ; সেই ফিৎরার অর্থ দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। কমিউনিজমের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে ?

বিশ্বমানবতার চরম রূপ প্রকাশ পায় মুসলমানের হজ্বে। বিশ্বের সমস্ত দিক হইতে দলে দলে মুসলমানগণ একই মিলন-কেন্দ্রে একই কা'বা শরীফে আসিয়া সমবেত হয় ; আরবী, পার্শী, তুর্কী, তাতারী, মিসরী, বোগদাদী, কাফ্রী, নিগ্রো, হিন্দুস্থানী, চীনাম্যান, জাপানী,

ইংরাজ, ফরাসী, জার্মানী—সব মুসলমানরাই সেদিন এক বেশ-ভূষা, এক আশা, এক ভাষা, এক লক্ষ্য, এক ধ্যান ; বিশ্বের মুসলমান সেদিন এক হইয়া একের বন্দনা করে। এককে কেন্দ্র করিয়া বহুর এমন মহা-মিলন—বিশ্বমানবতার এমন বাস্তব রূপ জগতের আর কোন ধর্মে নাই।

তারপর জাকাৎ। মানব-প্রেমের এও এক চূড়ান্ত নিদর্শন। অন্য ধর্মে দরিদ্রকে কেহ কিছু দান করুক, না করুক, ততটা যায় আসে না ; কিন্তু মুসলমানের কাছে দান-খয়রাৎ তাহার ধর্মেরই অঙ্গীভূত অবশ্য করণীয়। ধনীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া দরিদ্রকে ফিরাইয়া দেওয়াই হইল জাকাতের উদ্দেশ্য। জাকাত-প্রথার দ্বারা মুসলমানের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি নষ্ট হয় এবং অর্থ বিচরণশীল হইতে পারে। মুসলমানকে বাধ্য হইয়া তাহার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রকে দান করিতেই হয়। উদ্বৃত্ত আয়ের উপর শতকরা বার্ষিক আড়াই টাকা হিসাবে তাহাকে জাকাত দিতে হয়। ইসলামী আমলে এই জাকাতের অর্থ বা মাল 'বায়তুল মাল' তহবিলে (সাধারণ ধনাগারে) রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই তহবিল হইতে নিঃস্ব, দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা হইত। স্বয়ং খলিফা ছিলেন এই 'বায়তুল মালের' রক্ষক। সমগ্র মুসলমান জগৎ যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইত, তিনি ইচ্ছা করিলে ধন-রত্নের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন, তিনি কিনা দরিদ্রদিগের ধন আগুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। শুধু তাই নয়, তাঁহার নিজের ব্যয়বরাদ্দও এই 'বায়তুল মাল' তহবিল হইতে করা হইত। নির্দিষ্ট হারের এক কপর্দকও তিনি বেশী পাইতেন না। মহাপ্রাণ খলিফা হজরত ওমরের কথা ভাবুন। নিশীথ রাত্রে তিনি নিজে আটার বস্তা বহন করিয়া অনাথিনীর কুটিরে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এ দৃশ্যের কি তুলনা আছে !

(২) **বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতায় :**—কমিউনিজমে জাতিভেদ নাই, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্রের প্রভেদ নাই—মানুষ হিসাবে সকলেই

এখানে সমান। বংশ বা জাত্যাভিমান তুলিয়া দিয়া সে আনিয়াছে মানুষে মানুষে সমতা-জ্ঞান। এইখানে ইসলামের সহিত কমিউনিজ্‌মের গভীর সাদৃশ্য আছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলাম এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। সব মানুষই মূলতঃ সমান—এই হইল ইসলামের প্রধান শিক্ষা। মুসলমানেরা এক সঙ্গে উপাসনা করে, একসঙ্গে নামাজ পড়ে, একসঙ্গে খানাপিনা করে। তাহাদের আল্লাহ্‌ এক, রসুল এক, কোরান এক, লক্ষ্য এক—উদ্দেশ্য এক। এই জন্যই প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের খবর তাহারা রাখে এবং একের দুঃখে-কষ্টে অপরে সাহায্য করে। আদর্শ মুসলমান হইতে হইলে তাহাকে তাহার প্রতিবেশীর খবরও রাখিতে হয়, নৈলে শক্ত গুনাহ্‌ হয়।

বিশ্বমানবতাই ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার মানব-প্রেম সংকীর্ণ নয়, সমস্ত বিশ্বকেই সে আপনার বলিয়া জানে।

উৎকট জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ইসলামে নাই। মুসলিমের স্বদেশ-প্রেম তাই কোন দেশের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী হইয়া থাকে না। সমস্ত মানব জাতিকেই সে এক বলিয়া জানে। তার কোরানই তাকে শিক্ষা দিয়াছে :

"কানান্নামো উম্মাতান ওয়াহেদাৎ"

(কোরান, ২ : ২১৩)

অর্থাৎ : সমস্ত মানব-মণ্ডলী একজাতি।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

"হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে পরিবার ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি—যাহাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পার॥"

—(কোরান, ৫৯ : ১৩)

হজরত বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই।"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বই হইল ইসলামের সারকথা। মানুষের অন্তরে অন্তরে এমন নিগূঢ় আত্মীয়তার বন্ধন আর কোন ধর্ম দিতে পারে নাই। "আচ্ছালামো আলায়কুম" বলিলে অতি দূরের মানুষও মুসলমানের কাছে আপন হইয়া যায়। ইসলামের কবি সাধে কি গাহিয়াছেন :

"মুসলিম হ্যাঁয় হাম ওয়াতন্‌ হ্যায়
সারা জাহাঁ হামারা।"

অর্থাৎ : আমি মুসলিম নিখিল বিশ্বই আমার স্বদেশ।

এই যে অন্তরের সম্প্রসারণ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা, ইহা ইসলামের এক মস্ত বড় অবদান। কমিউনিজম এই জিনিসটাই আনিতে চায়।

(৩) আন্তর্জাতীয়তায়—সোভিয়েট রাশিয়ায় বর্তমানে ১৬টি রিপাবলিক আছে। প্রত্যেকেরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও সভ্যতা স্বতন্ত্র। কমিউনিজম এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া একটি আন্তর্জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। এই যে জাতিতে জাতিতে মৈত্রীভাব ও শান্তি-স্থাপন—ইহাও ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে। ইসলামের স্বদেশ-প্রেমের মূল্যও যথেষ্ট। "স্বদেশপ্রেম ঈমানেরই অংশ"। (হাব্বুল ওয়াতান মিনাল্‌ ঈমান) ইহা হযরত মোহাম্মদের বাণী। কিন্তু মুসলমানের স্বদেশ-প্রেম অপর সকল জাতির ন্যায় সংকীর্ণ নয়। স্বাদেশিকতাই তার কাছে চরম কাম্য নয়। ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেম নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জাতীয়তা (Nationalism) তাই তার লক্ষ্য নয়; আন্তর্জাতীয়তাই (Internationalism) তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন হিজরৎ করিয়া মদিনায় প্রস্থান করেন, তখন সেখানে ইহুদী, খ্রীষ্টান, আউস, খাজরাজ, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন

গোত্রের লোকদিগকে লইয়া তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র রচনা করেন। এই সম্পর্কে তিনি যে একটি সনদ দান করেন, তাহা আন্তর্জাতীয়তার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। সেই সনদের প্রধান শর্ত এই ছিল যে—কেহ কাহারও ধর্ম, সংস্কার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না এবং পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া দেশ রক্ষা করিবে। এ সম্বন্ধে কোরানের আদেশও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ—

"(হে মোহাম্মদ, বিধর্মীদিগকে বল) তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে।"

—সুরা কাফেরুণ

"ইসলামে বলপ্রয়োগ নাই।"

—কোরান, ২ ঃ ২৫৬

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি ইসলাম কিরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহাদিগকে কতখানি অধিকার দিয়াছে, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

(৪) পুঁজিবাদের বিরুদ্ধতায়—কমিউনিজ্‌ম পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। পৌত্তলিকতার সহিত ইসলামের যেমন বিরোধ, পুঁজিবাদের সহিত কমিউনিজমের ঠিক তেমনি বিরোধ। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্যই কমিউনিজমের জন্ম। ইসলামও পুঁজিবাদের বিরোধী। তবে কমিউনিজ্‌ম যেরূপ পুঁজিবাদকে একেবারে ধ্বংস করিতে চায়, ইসলাম ঠিক সেরূপ চায় না। পুঁজিবাদের দোষ-ত্রুটিকে ইসলাম সংশোধন করতে চায়। পুঁজিবাদের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, সমাজের অর্থ-সম্পদকে সে বিচরণশীল হইতে দেয় না; মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের হস্তেই এই অর্থশক্তি আবদ্ধ হইয়া থাকে। পুঁজিবাদীদিগের মজুত করিবার প্রবৃত্তিই হইল যত অনর্থের মূল। ইসলাম এই প্রকার ধন-সঞ্চয়ের ঘোর বিরোধী। সমাজের অর্থ যাহাতে হাতে হাতে ঘুরাফেরা করিতে পারে এবং এই উপায়ে সকলেই যাহাতে অভাব

হইতে মুক্ত হয় ইসলাম সেই ব্যবস্থা করিয়াছে। কাহারও হস্তে অর্থ সঞ্চিত হইলেই শতকরা বার্ষিক ২½ টাকা তাহাকে দান করিতেই হয়। ইহা ছাড়াও অর্থ না খাটাইয়া ঘরে মজুত করিয়া রাখা ইসলামের বিধানে মহাপাপ। কোরান বলিতেছে :

"এবং যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুত করিয়া রাখে এবং আল্লাহর রাহে (অর্থাৎ সৎকর্মে) ব্যয় না করে তাহাদের জন্য ঘোর শাস্তি আছে, এ কথা ঘোষণা করিয়া দাও।"

সেইদিন যেদিন দোজখের আগুনে পুড়াইয়া তাহাদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে আগুনের দাগ কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে : তোমরা যাহা মজুত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা এই; সেই মজুত করা সামগ্রী এখন খাও। (৯-৩৪-৩৫)

ঠিক ইহারই সমর্থনে হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"আবু হোরায়রা বলিতেছেন—হজরত রসুলে করিম বলিয়াছেন : যে সমস্ত লোক টাকাকড়ি মজুত করিয়া রাখে এবং দরিদ্রদিগের প্রাপ্য দান করে না, বিচারদিনে তাহাদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে আগুন দিয়া দাগ কাটিয়া দেওয়া হইবে।"

এই সমস্ত কোরানিক আদর্শকেই কি কমিউনিজ্‌ম্‌ নবভাবে প্রচার করে নাই? ইসলামের পূর্বে ধনিক বা পুঁজিবাদীদিগকে এমন তীব্র কশাঘাত আর কে করিয়াছে? একদিকে মজুত না করিবার তাকিদ, অন্যদিকে বিতরণ করিবার তাকিদ। দুইটি উদ্দেশ্যই হইল সমাজে ধনসাম্যের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র-নিবারণ।

অতএব দেখা যাইতেছে, কমিউনিজ্‌ম্‌ যে উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এত লড়াই করিতেছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইসলাম বহু পূর্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদের নিজের জীবনে এই আদর্শই আমরা প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বিবি খাদিজার অগাধ ধন-সম্পত্তির তিনি মালিক

হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইসলাম যখন বিজয়ী হইল, তখন যুদ্ধলব্ধ ধন-রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশও তাঁহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই বিপুল অর্থ ও সম্পদ? সমস্তই তিনি দীন-দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়া দিলেন। বহুভাবে বহু অর্থ তাঁহার হাতে আসিত, কিন্তু মহামানব তিন দিনের বেশী তাহা ঘরে মজুত করিয়া রাখিতেন না। মৃত্যুর সময়েও সঞ্চিত তিনটি দিনার বিতরণ করা হইয়াছে কি না, বার বার করিয়া তাহা বিবি আয়েশাকে শুধাইয়াছেন এবং সেগুলি বিতরণ না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হন নাই। মৃত্যুকালে নিজের যাহা কিছু যৎ-সামান্য ধন-সম্পত্তি ছিল—সমস্তই তিনি দুঃস্থদিগের কল্যাণে দান করিয়া যান এবং বলেন: "পয়গম্বরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকার নাই।"

(৫) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতায়—শুধু পুঁজিবাদের বিলোপ সাধনই কমিউনিজমের একান্ত উদ্দেশ্য নয়; যেহেতু পুঁজিবাদ হইতেই সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে, এ কারণে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করাও কমিউনিজমের অন্যতম লক্ষ্য। অন্য কথায়: সাম্রাজ্যতন্ত্র তুলিয়া দিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই কমিউনিজমের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, ইসলামের লক্ষ্যও তাই। ইসলাম স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। গণতন্ত্রই ইসলামের রাষ্ট্র-আদর্শ। কমিউনিজম যেমন রাজতন্ত্র তুলিয়া দিয়া প্রতিনিধিত্বমূলক গণশাসন প্রবর্তন করিয়াছে, ইসলাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অবিকল ইহাই করিয়া রাখিয়াছে। ইসলামের খেলাফৎ-তন্ত্র সোভিয়েটতন্ত্রেরই জন্মদাতা। মুসলমানের 'খলিফা' বা 'আমিরুল মুমেনিন'ও যা সোভিয়েট রাশিয়ার 'ডিক্টেটর'ও ঠিক তাই। হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশাতেই এই নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয়। হজরত নিজেই ছিলেন ইহার পথপ্রদর্শক। তারপর তাঁহার মৃত্যুর পর বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য কোন সম্রাট নির্বাচিত হন নাই—হইয়াছে খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। অবশ্য এই ইসলামিক সাধারণতন্ত্র বেশীদিন স্থায়ী

হয় নাই; 'খোলাফায়ে রাশেদীন' অর্থাৎ প্রথম খলিফা চতুষ্টয় (হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী) এই আদর্শকে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার পরই মুসলিম জগতে বংশানুক্রমিকভাবে খলিফা নির্বাচন আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্যতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল দীর্ঘ হয় নাই সত্য; কিন্তু তাহাতে কিছুই যায় আসে না। নূতন আদর্শ প্রদর্শনের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। হজরত মোহাম্মদ বহু আদর্শের শুধু রেখাপাতই করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সেই সব আদর্শ লইয়া ভবিষ্যৎ জগৎ গড়িয়া উঠিবে—ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই হিসাবে স্বল্পকালস্থায়ী খোলাফায়ে রাশেদীন বিশ্ববাসীর পক্ষে পরম সম্পদ। দীর্ঘ চতুর্দশ শতাব্দী পরে এই খোলাফায়ে রাশেদীনের পাশ্চাত্য রূপ আমরা রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাইতেছি। লেনিন বা ষ্ট্যালিন নবযুগের একজন বিধর্মী খলিফা বিশেষ। নয় কি? ইসলামের অনুকরণ ছাড়া ইহাকে আর কী বলা যায়? মুসলমানের কাছে কমিউনিজম তাই আদৌ কোন বিস্ময়ের বস্তু নয়। কমিউনিজম ইসলামেরই অনুকরণ মাত্র—নূতন সৃষ্টি নয়। আর—যেহেতু ইহা অনুকরণ, এই কারণেই ইহা অসম্পূর্ণ এবং মৌলিক হইতে এক ধাপ নীচু।

(৬) শক্তির সাধনায়:—কমিউনিষ্টরা শক্তির পূজারী। তাহাদের ধ্যান-ধারণা অপর সকলে সহজে গ্রহণ না করিতে চাহিলে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অথবা বিপ্লব ঘটাইয়া তাহারা নিজেদের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এই শক্তিমন্ত্র কমিউনিষ্টরা ইসলামের 'জেহাদ' হইতে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য জেহাদের তাৎপর্য আরও মহৎ। ইসলামের ধ্যান-ধারণা যাহাতে বিনা বাধায় পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতে পারে সেই জন্যই তার পিছনে ছিল শক্তির এই সতর্ক পাহারা। যেখানে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রশ্ন, সেখানে শক্তির

প্রয়োজন আছে বৈ কি। সত্য, ন্যায় ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অহিংসা দ্বারা প্রায়ই তাহা সম্ভব হয় না। সত্য ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করার নাম জেহাদ। এই জেহাদের মন্ত্রই কমিউনিষ্টরা আজ বিকৃতভাবে নিজেদের কাজে লাগাইতেছে।

(৭) সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থায়ঃ—কমিউনিজ্‌ম্ ধনসম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত অধিকার তুলিয়া দিয়াছে এবং সমস্ত সম্পত্তিই ষ্টেটের—এই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্ সমস্ত সম্পত্তি ষ্টেটকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইসলাম ইহা অপেক্ষাও আর এক ধাপ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কোরান বলিতেছে ঃ—

"লা হু মা ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়া মা ফিল্ আরদ্"

অর্থাৎ ঃ আকাশ পৃথিবীর যাহা কিছু সমস্তই আল্লাহ্‌র।

'সমস্ত সম্পত্তি ষ্টেটের' এই কথার চেয়ে 'সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র'—এই কথার মধ্যেই কি বৃহত্তর কমিউনিজম নাই? সমস্ত কিছুর মালিকই আল্লাহ্—একথা দ্বারা সবকিছুতেই যে মানব সমাজের তুল্য অধিকার আছে, তাহাই বলা হইয়াছে। যেমন উপভোগ্য আলো বাতাস, তেমনি উপভোগ্য ধন-সম্পদ। উপভোগের এক অধিকার আল্লাহ্ তা'লারই দান। কাজেই সেই অধিকার হইতে যদি কেহ কোন মানুষকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহা গুরুতর অন্যায় ও পাপ। ধন-সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থা তাই এমন হওয়া উচিত—যেন সকলেই উহা উপভোগ করিতে পারে। মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক যদি যত পায় ততই গ্রাস করিয়া বসে, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে অপরের ন্যায্য প্রাপ্যই গ্রাস করে। কোরান এই সর্বগ্রাসী লোভাতুর-দিগের উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন :

"হে বিশ্বাসীগণ, অন্যায় করিয়া তোমরা কাহারও কোন সম্পত্তি গ্রাস করিও না।" —(৪ ঃ ১৯)

ইসলামে জমিদারী প্রথাও এই কারণে জায়েজ নয়। জমিদারী প্রথার মূলে আছে "সমস্ত সম্পত্তি রাজার" (All land belongs to the king)—এই নীতি। রাজা বড় বড় লোকদিগকে তাঁহার সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়াতেই জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম বলে সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ই হইতেছেন "মালেকুল্ মুল্‌ক্" কাজেই আল্লাহ্‌র সম্পত্তিতে সকলেরই ন্যায্য অধিকার থাকিবে ইহাই ইসলামী বিধান। কোরান বলিতেছে ঃ

"(তাহারা এই ভীষণ আগুনে পুড়িবে) যাহারা ধন-সম্পত্তি মজুত করিয়া বা বন্ধ করিয়া রাখে।" —(৭০ ঃ ১৮)

ধন-সম্পত্তিতে যে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের একটা বিশিষ্ট অংশ আছে সে সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে ঃ

"(তাহারাই শাস্তি পাইবে না) যাহারা তাহাদের সম্পত্তি হইতে একটা নির্দিষ্ট অংশ ভিক্ষুক এবং অভাবগ্রস্তদিগকে দান করে।" —(৭০ ঃ ২৪—২৫)

হাদিস-শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ

"আদম সন্তানের মাত্র এইটুকুই অধিকার আছে যে, সে শুধু একখানি বাসোপযোগী গৃহ পাইবে, লজ্জানিবারণের উপযোগী একখানি বস্ত্র পাইবে এবং এক টুকরা রুটী এবং কিছু পানি পাইবে।" —(তিরমিজী)

আর একটি হাদিসে আছে ঃ—

"যাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারবাহী পশু আছে, সে যেন যাহার নাই তাহাকে বেশীটা দান করে। যাহার বেশী খাদ্যশস্য আছে, সে যেন যাহার নাই তাহাকে বেশীটা দেয়,....এইরূপে হজরত আরও অনেক জিনিসের নাম করিলেন যদ্দারা আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, কোন অতিরিক্ত জিনিসেই আমাদের কোন অধিকার নাই। —(মুসলিম ও আবু দাউদ)

মুসলমানের 'ওয়াক্‌ফ্‌' আইনে কোরান ও হাদিসের এই আদর্শই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মুসলমান তাহার ধন ও সম্পত্তিকে 'ওয়াক্‌ফ্‌' করিয়া আল্লাহ্‌র হাতে তুলিয়া দেয়। আর্ত, পীড়িত, অত্যাচারিত এবং অভাবগ্রস্তদের সেবা ও সাহায্য এবং দেশের বহু জনহিতকর কার্য ওয়াক্‌ফ্‌ স্টেট্‌ হইতে সাধিত হয়।

এইখানেই শেষ নয়। মুসলিমের ধন-সম্পত্তি যে বিতরণের জন্য,—এক হাতে মজুত করিয়া রাখিবার জন্য নয়—তাহার আর একটি বড় প্রমাণ: সম্পত্তির ফারায়েজ ব্যবস্থা। মুসলমানের সম্পত্তিতে বহু আত্মীয়-স্বজনের অংশও দাবী থাকে। শুধু যে পুরুষেরাই অংশীদার হয়, তাহাও নহে; মেয়েরাও অংশ পায়। মুসলমানদের সম্পত্তি তাই এক হাতে পুরুষানুক্রমে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। ইহা বিচরণশীল, হাতে হাতে ইহা ঘুরাফেরা করে। মুসলমানের জমিদারী বা সম্পত্তি ভাগ হইয়া যায় বলিয়া অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি ইসলামী উত্তরাধিকার-আইনকে নিন্দা করিত; কিন্তু কমিউনিজমের কল্যাণে ঐ নিন্দাই এখন প্রশংসায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দু-সমাজে এখন আইন করিয়া এই বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস চলিতেছে। আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছে, হজরত মোহাম্মদ কী অপরিসীম কল্যাণই না বিশ্ববাসীর জন্য বহন করিয়া আনিয়াছেন। পুঁজিবাদী এবং স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিরাই ইসলামের এই বিতরণ-মূলক ব্যবস্থাকে নিন্দা করিবে, কিন্তু যাহারা আদর্শবাদী, যাহারা মানব-প্রেমিক ও গণতন্ত্রের উপাসক, তাহারা ইসলামের এই দূরদর্শিতা দেখিয়া অবাক হইবে। জগতের চিন্তাধারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া ইসলামের দিকেই আসিতেছে কি-না, পাঠক তাহা চিন্তা করুন।

(৮) সুদপ্রথা নিবারণে:—সুদপ্রথা পুঁজিবাদের প্রধান সহায়ক। কমিউনিজ্‌ম্‌ তাই এই সুদপ্রথা একেবারে তুলিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় কোনরূপ মহাজনী কারবার নাই। বলাবাহুল্য, ইহাও

ইসলামের জয়-ঘোষণা। ইসলাম সুদকে যে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে, একথা সকলেই জানেন। কোরান বলিতেছে:

"যাহারা সুদ খায় তাহারা উন্নতি করিতে পারে না—আল্লাহ্‌ তেজারতি হালাল করিয়াছেন, কিন্তু সুদকে হারাম করিয়াছেন।" —(২ : ২৭৫)

"হে বিশ্বাসীগণ, কখনও সুদ খাইও না—একটির পর একটি (চক্রবৃদ্ধি হারে) এবং আল্লার প্রতি তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হও—যাহাতে তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।" —(৩ : ১২৯)

অন্যত্র আছে:

"এবং ধন-সম্পত্তি বাড়াইবার আশায় সুদের দ্বারা যাহাই কেন উপার্জন কর না, উহাতে আল্লার নিকট তোমাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইবে না, বরং যাহা কিছু তোমরা আল্লার খুশীর জন্য দান কর—তাহারাই সেই লোক, যাহারা বহুগুণ বেশী পাইবে।"—(৩০ : ৪৯)

সুদ মানুষের অন্তরকে পাষাণ করিয়া তোলে। Shylock যে Antonio-র বুক হইতে এক পাউন্ড মাংস কাটিয়া লইতে চাহিয়াছিল ইহা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি মরিয়া গেলে মানুষের এই দশাই ঘটে। মানুষকে শোষণ করিয়া নিজে বড় হইবার এই জঘন্য প্রবৃত্তি সমাজতন্ত্রের ঘোর প্রতিকূল (anti-social); কাজেই ইসলাম ইহাকে এত ঘৃণা করিয়াছে। শুধু যাহারা সুদ খায়, তাহাদিগকেই যে ইসলাম শাস্তির ভয় দেখাইয়াছে, তাহা নয়। সুদ যাহারা দেয়, সুদের দলিল যাহারা লিখে এবং সেই দলিলে যাহারা সাক্ষী হয়—সকলেই তুল্যরূপে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এখানে ইসলামের সত্য আজ কমিউনিজমের মধ্য দিয়া কী উজ্জ্বল বেশেই না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(৯) শ্রমের মর্যাদা দানে:—কমিউনিজ্‌ম্‌ শ্রমের মর্যাদা (Dignity of labour) দিয়াছে। 'No work, no bread' (কাজ

না করিলে খাইতে পাইবে না)—ইহাই কমিউনিজমের মূলমন্ত্র। অলস নিষ্কর্মা হইয়া সঞ্চিত অর্থ উপভোগ করা—সে চলিবে না, প্রত্যেককেই কাজ করিয়া খাইতে হইবে। কমিউনিজ্‌ম্‌ তাই ভিখারী ও নিষ্কর্মা-দিগকে দু'চোখ পাতিয়া দেখিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রমিকদিগকে লইয়াই কমিউনিজমের কারবার ; শ্রমিকদের হাতেই দেশের শাসন এবং পরিচালন। কাস্তে এবং লাঙ্গল হইল তা কমিউনিজমের প্রতীক। কাজেই কমিউনিজ্‌ম্‌ যে শ্রমকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই যে কর্মপ্রীতি এবং শ্রমের মর্যাদা দান, ইহাও ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম আসিবার পূর্বে জগতের কোন ধর্মই শ্রম বা কর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম ছিল নির্বাণের ধর্ম-অহিংসার ধর্ম। কর্মবিমুখতাই ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'শ্রমণ' ও 'ভিক্ষু' গঠনই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া নির্বাকভাবে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়ানই হইল আদর্শ বৌদ্ধের কাজ। হিন্দুধর্মের আদর্শও ছিল সন্ন্যাস। ষড়দর্শনের কোথাও কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। এই জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখ হইতে মুক্তি বা কৈবল্য লাভই হইল হিন্দু-দর্শনের সার কথা। এই মুক্তির শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে কর্ম বর্জন, কারণ কর্মই হইতেছে বন্ধন, কর্মই হইতেছে সকল দুঃখের মূল, কেননা কর্মফলেই মানুষকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কর্ম ঘৃণ্য বলিয়াই ত যত-কিছু শ্রমসাধ্য কর্ম শূদ্রদিগকে করিতে বলা হইয়াছে, আর তাহাদিগকে নানাবিধ নীচ কর্ম করিতে হয় বলিয়াই ত সমাজে তাহারা পতিত এবং অস্পৃশ্য। সংসারের কর্মে লিপ্ত হইয়া পাছে শূদ্রকুলে জন্মিতে হয়, এ ভয় প্রত্যেক হিন্দুর আছে। পুনর্জন্মবাদের ধারণা তাই হিন্দু-মনকে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন করিয়া রাখিতে বা কর্মই যখন জীবনের বন্ধন এবং সেই বন্ধনের ফলেই যখন তাহার বারে বারে প্রত্যাবর্তন, তখন কর্ম হইতে যতটা দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল—ইহাই হিন্দু ধর্মের কর্ম-দর্শন।

খৃষ্টধর্মও মূলতঃ সন্ন্যাসের (renunciation) ধর্ম। সেখানেও কর্মকে উচ্চ আসন দেওয়া হয় নাই। যীশু খৃষ্টকে আমরা কোন অবস্থাতেই কর্মীরূপে দেখি নাই। শুধু প্রেম-প্রীতি এবং নীতি-বাক্যই তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু হজরত মোহাম্মদ আনিলেন জীবনের এক নূতন দর্শন। বংশকে মর্যাদা না দিয়া মর্যাদা দিলেন তিনি কর্মকে। কর্মে যে বড় হইবে, সেই বড়—ইহাই তাঁহার কথা। জীবনের অর্থই হইল কর্ম, এ জীবন কর্মময়, কর্মের জন্যই মানুষকে দুনিয়ায় পাঠান হইয়াছে। মানব-জীবন একটি ক্ষেত্র বিশেষ, পরিশ্রম দ্বারা চাষ করিয়া এখানে সুকর্মের বীজ বপন করিলে পরিণামে তাহা হইতে সুফল পাওয়া যাইবে, পক্ষান্তরে এ জমি পতিত রাখিলে কোন ফলই ফলিবে না--ইহাই জীবনের সহজ ব্যাখ্যা। ইসলাম তাই শুধু নীতি-বাক্যের ধর্ম নয়, কর্মের ধর্ম।

কর্ম সম্বন্ধে কোরান কি বলিতেছে, দেখুন ঃ—

"উৎকৃষ্ট পুরস্কার হইতেছে কর্মীর পুরস্কার।"—(৩ ঃ ১৩৫)

"এবং নিশ্চয়ই মানুষের জন্য তাহার কৃতকর্মের পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই নাই।"—(৫৩ ঃ ৩৯)

"যাহারা অলসভাবে বসিয়া থাকে, তাহাদের চেয়ে যাহারা কাজ করে, তাহাদিগকেই আল্লাহ ভালবাসেন।"—(৪ ঃ ৩৫)

শ্রমিকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় রসুলকে দিয়া বলাইতেছেন ঃ

"বল, হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া কাজ কর, নিশ্চয়ই জানিও (তোমাদের মত) আমিও একজন শ্রমিক।"—(কোরান, ৩৯ ঃ ৩৯)

"যাহার শরীরে সামর্থ্য আছে, অথচ কাজ করে না, আল্লাহ্‌ তাহাকে ভালবাসেন না।"

৫—

"নিজ হাতে কর্ম করিয়া যাহা খাওয়া হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কেহ কখনও খাইতে পারে না।" (বোখারী)

"খাঁটি মুসলমান কপালে ঘর্ম লইয়া মরে।"

—(তিরমিজী ও নেসাঈ)

ইহাই ইসলামের আদর্শ। এই আদর্শ হজরত মোহাম্মদ কেবল যে মুখে প্রচার করিয়াছেন, তাহা নহে—কার্যতও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ হাতে মাটি কাটিয়াছেন, নিজ হাতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজ হাতে মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছেন, জুতা মেরামত করিয়াছেন, পিরহান সেলাই করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন, সৈন্য চালনা করিয়াছেন, রাজ্যশাসন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে হজরতের ছিল কর্মময় জীবন। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন।

অতএব আমরা দেখিলাম, ইসলাম জীবনকে যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছে, কমিউনিজমও ঠিক তাহাই করিয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথে চলিয়াছে, এই যা পার্থক্য।

(১০) **দাস প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে ঃ**—সোভিয়েট রাশিয়ায় দাস প্রথা নাই। সকলকেই সম-অধিকার দান করায় এবং ধন-সম্পত্তি সকলের মধ্যেই বিভাগ করিয়া দেওয়ায়, দাসপ্রথা আপনা-আপনিই উঠিয়া গিয়াছে। ইসলামেরও আদর্শ ঠিক ইহাই ছিল। ইসলাম দাসকে সর্ব প্রকারে স্বাধীন মানুষের অধিকার দিয়াছে। হজরতের জীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—'ওকাজ' মেলা হইতে বিবি খাদিজা 'জায়েদ' নামক একটি দাসকে খরিদ করিয়া হজরতকে উপহার দিয়াছিলেন। হজরত জায়েদকে পাওয়া মাত্র তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, জায়েদকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ "তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, জায়েদ আমার পুত্র, সে আমার উত্তরাধিকারী আর আমি তাহার উত্তরাধিকারী।"

এইখানেই শেষ নয়, এই জায়েদের সঙ্গে তিনি আপন ফুফাতো বোন জয়নাবকে বিবাহ দিয়াছিলেন। তারপর এই জায়েদের পুত্র 'ওসামা'ই সিরিয়া অভিযানে সেনাপতিপদে বরিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীনও ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। দাসমুক্তির এমন অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে কোথাও নাই।

(১১) **শিক্ষা বিস্তারে ঃ**—সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা এখন বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকেই শিক্ষার আলোক পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। পূর্বে শিক্ষা শুধুই উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কি ভারত, কি পারস্য, কি মিসর, কি ইউরোপ—সর্বত্রই শিক্ষা ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত না। ইসলাম এই জঘন্য প্রথা তুলিয়া দিয়া সকল মানুষকেই জ্ঞানের আলোকে মুক্তিদান করিবার অধিকার দিয়াছে। "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর বিদ্যাশিক্ষা করা ফরজ"—ইহাই হজরতের বাণী। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ—

"এক মুহূর্তের জ্ঞান-চিন্তা সহস্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।"

কাজেই দেখা যাইতেছে, এই যে রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়ইাছে, ইহা ইসলামের প্রেরণারই ফল। ইসলামের পূর্বে সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

(১২) **নারীর মুক্তি সাধনে ঃ**—সোভিয়েট রাশিয়ায় পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও মুক্তি পাইয়াছে। সর্ববিষয়ে তাহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এখানেও ইসলাম তলে তলে ক্রিয়া করিতেছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলাম নারীজাতিকে যে স্বাধীনতা ও অধিকার দান করিয়া রাখিয়াছে, আজ পর্যন্ত তাহা বিশ্ববাসীর অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মেই

নারীর কোন মর্যাদা ছিল না, নারীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই মনে করা হইত। সর্বপ্রকারে সে ছিল পুরুষের অধীন ; ঘৃণ্য ছিল তার জীবন ও কর্ম ; কোন প্রকারের আইনঘটিত অধিকার ছিল না তার। ঠিক এই অবস্থায় ইসলাম উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিল ঃ—

"হে মানবসকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও, যে-প্রভু একজন হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গিনীকে একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারীকে পয়দা করিয়াছেন।"

—(কোরান, ৪ ঃ ১)

"এবং পুরুষদের উপর স্ত্রীদের ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে—যেমন স্ত্রীদের উপর পুরুষদের আছে।" (কোরান, ২ ঃ ২২৮)

"তোমরা তাহাদের ভূষণ এবং তাহারা তোমাদের ভূষণ।"

—(কোরান)

"পুরুষ যাহা উপার্জন করিবে, তাহার ফল সে ভোগ করিবে। নারী যাহা উপার্জন করিবে, তাহার ফল সে ভোগ করিবে।"

—(কোরান, ৪ ঃ ৩২)

"যে কেহই সৎকর্ম করিবে—পুরুষই হউক, নারীই হউক—আমরা তাহাদের জীবনকে আনন্দময় করিব এবং তাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মের জন্য নিশ্চয়ই পুরস্কার দিব।" —(কোরান, ১৬ ঃ ৯৭)

শুধু ইহজীবনে নয়, পরজীবনেও স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান থাকিবে বলিয়া কোরান ঘোষণা করিতেছে ঃ—

—"কেহই সৎকর্ম করিবে—পুরুষই হোক, নারীই হোক এবং তারা যদি বিশ্বাসী হয়—বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের কাহারও প্রতি এক বিন্দু অবিচার করা হইবে না।"

—(কোরান, ৪ ঃ ১২৪)

বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দেন-মোহরের ব্যবস্থা, স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার, সম্পত্তির ফারায়েজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান—ইত্যাদি সবকিছুই নারীর প্রতি ইসলামের মর্যাদাবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন।

(১৩) অন্যান্য বিষয়ে ঃ—কমিউনিজমের অন্যান্য ধারণাও ইসলাম হইতে ধার করা। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে 'কমরেড' (Comrade) বলা হয়। এই 'কমরেড' কথাটিও ইসলামী কায়দা-মাফিক। 'কমরেডের' অর্থ সহচর বা সহকর্মী। হজরত মোহাম্মদের সমসাময়িক শিষ্যদিগকেও একই অর্থে 'সাহাবা' নামে অভিহিত করা হইত। এই 'সাহাবা' বা সহকর্মীর পরিভাষাই হইল 'কমরেড'। সাহাবা শব্দটি সমতা বা ভ্রাতৃত্ব-বোধক। স্বয়ং হজরত মোহাম্মদকেও আল্লাহ্‌তালা অন্যান্য মুসলমানদের 'সাহাবা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"মাদাল্লাহো সাহাবোকুন ওয়া মা গাওয়া।"

অর্থাৎ ঃ—তোমাদের সাহাবী (বন্ধু) মোহাম্মদ কখনও ভুল করেন না বা ব্যর্থ হন না। (কোরান, ৫৩ ঃ ২)

বলশেভিকদিগের জাগরণ-মন্ত্রেও ইসলামের ছাপ পড়িয়াছে। বলশেভিকদিগের বাণী হইতেছে ঃ—"World comrades, arise !" অর্থাৎ ঃ—"বিশ্ব-কমরেড, জাগো"! এই 'জাগো (arise) কথাটি কোরানের। এটি কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবারই বাণী। আল্লাহ্‌তা'লা ঠিক এই কথাটি বলিয়াই হজরত মোহাম্মদের কর্মজীবনকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন ঃ—

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, জাগো এবং সকলকে সতর্ক কর।"

—(কোরান, ৭৩ ঃ ১)

কমিউনিস্টরা কোন এক বিশেষ দেশে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায় না—সমস্ত বিশ্বকে তাহারা নিজেদের মতে

দীক্ষিত করিতে চায়! "World Communism" অর্থাৎ বিশ্ব-কমিউনিজমই তাহাদের লক্ষ্য। স্বীয় মতকে নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া দিবার এই যে স্বপ্ন—ইহাও ইসলাম হইতে গৃহীত। Pan-Islam-ই World Communism-এর জন্মদাতা। প্যান-ইসলাম অ-মুসলমানদের নিকট যেমন ভয়ের বস্তু, World Communism-ও তেমনি ভয়ের বস্তু অন্যান্য দেশের পক্ষে।

ইসলামের মূলমন্ত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" ইহার সহিতও কমিউনিজমের আশ্চর্যভাবে খানিকটা মিল ঘটিয়াছে। ইসলাম বলিতেছে: কোন ঈশ্বর নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। অতএব দেখা যাইতেছে, সর্বপ্রথমেই ইসলাম যাবতীয় মিথ্যা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে। মুসলমানকে সর্বাগ্রে বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাহাদের উপাস্য অন্য কোন ঈশ্বর নাই। এই 'না'-এর তরবারি দ্বারা সমস্ত মনগড়া মিথ্যা ঈশ্বরের মাথা কাটিয়া তারপর সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে অন্তরের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। কমিউনিস্টরাও ঈশ্বরকে একদম উড়াইয়া দিয়াছে। "কোন ঈশ্বর নাই" ইহাই তাহাদের মত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে: ইসলামের মূলমন্ত্রের না-মূলক অংশটিকে (Negative portion) অর্থাৎ: 'লা-ইলাহা'-টুকু তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, এখন হ্যাঁ-মূলক অংশটুকু তাহারা গ্রহণ করতে বাকী। "ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" টুকু লইলেই পুরাপুরি ইসলামকে গ্রহণ করা হইবে। সেই সময়ে কমিউনিজমের দোষত্রুটিও দূর হইয়া যাইবে। পতিত জমিতে ভাল শস্য বুনিতে হইলে পূর্ব হইতেই যেমন সমস্ত আগাছা কাটিয়া চাষ করিয়া রাখিতে হয়, কমিউনিজমও ঠিক যেন সেইরূপই রাশিয়াবাসীদের অন্তরভূমি হইতে সমস্ত মিথ্যা ঈশ্বররূপ আগাছাকে কাটিয়া মাটি চষিয়া 'জো'-এর অপেক্ষায় আছে। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলেই সুফল অনিবার্য।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"—এই মূলমন্ত্রের মধ্যে কমিউনিজমের তিনটি ধারাই বিদ্যমান। "লা-ইলাহা" (নাই কোন ঈশ্বর) হইল Thesis; "ইল্লাল্লাহ্" (এক আল্লাহ ব্যতীত) হইল antithesis, আর 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' (আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ) এই হইল Synthesis. কমিউনিস্টরা এখন পর্যন্ত মাত্র গোড়ার অংশটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট আছে।

মার্কস্ ও লেনিন যখন ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন, তখনকার খৃস্টান জগতের কথা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। পাদ্রী-পুরোহিতদিগের মনগড়া বহু দেবদেবী মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে তখন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারই ফলে মানুষে মানুষে ঘৃণা, বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও কুসংস্কার পর্বতপ্রমাণ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া পুরোহিতদিগের (Charch-এর) এমনি অপ্রতিহত প্রভাব ছিল যে, যখনই কোন সংস্কারমূলক কর্মে দেশনেতারা হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেন তখনই দেশের সম্রাট পুরোহিতদিগকে হাত করিয়া সকল প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দিতেন। এই জন্যই মার্কস ও লেনিন ভাবিয়াছিলেন, মানুষে মানুষে সাম্য ও একতা স্থাপনের পথে ধর্মই যখন পদে পদে বাধা দিতেছে, তখন ধর্মকে দাও একদম উড়াইয়া। ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা ঘোষণা করিলেন: ঈশ্বর বা ধর্মকে আমরা মানি না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা দ্বারা নাস্তিকতা প্রচারিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু অন্ধবিশ্বাসের মূলেও কুঠারাঘাত করা হইয়াছে—মিথ্যা কুসংস্কার ও ভেদ-বৈষম্যের প্রভাব হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিয়া আনিয়া উদার নীল আকাশের তলে তাহাকে দাঁড় করান হইয়াছে। এই কারণেই অত জাতিভেদ ও পার্থক্যের মধ্যেও মানুষ অত সহজে মানুষকে 'ভাই' (Comrade) বলিয়া কাছে ডাকিয়া লইতে পারিয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এই নাস্তিকতা কমিউনিজমের চরম কথা নয়, ইহা পুরোহিতদিগের দৌরাত্ম্যের প্রতি একটা প্রচণ্ড আঘাত মাত্র।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কমিউনিজমের যতকিছু ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনা, সমস্তই ইসলাম হইতে ধার করা। কাজেই মুসলমানের কাছে ইহা কোন নূতন বস্তু নয় বা বে-খাপ্পাও নয়। অবশ্য ইহার সবকিছুই ইসলামের সহিত হুবহু মিলিয়া যায় না; যেখানে মিলে না, সেখানেই ইহার একটি ত্রুটি এবং সেইখানেই আমাদের আপত্তি।

এইবার আমরা সেই দোষত্রুটি ও পার্থক্যের কথাই বলিব।

ইসলামের সহিত কমিউনিজ্মের পার্থক্য

(১) কমিউনিজম্ মূলতঃ ইসলামবিরোধী :—ইসলামের সহিত কমিউনিজমের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ ইহা ইসলামের আকিদা, দর্শন ও ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান পার্থক্য হইতেছে : ইসলাম আস্তিকতা-মূলক; আর কমিউনিজম নাস্তিকতামূলক। ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনই কমিউনিজমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শ্রেণীহীন সমাজ মানা যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌হীন সমাজকে ইসলাম কিছুতেই মানিতে পারে না।

মানুষকে তিনটি মৌলিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয় : (১) আল্লাহর সহিত সম্বন্ধ, (২) বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ; (৩) মানবজাতির সহিত সম্বন্ধ। আল্লাহ্‌র সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতেছে খালেক-মাখ্‌লুকের (স্রষ্টা-সৃষ্টির) সম্বন্ধ। আল্লাহই আমাদের 'রব', আমাদের জীবন-মরণ তাঁহারই অনুগ্রহের দান, 'মারেন মরি', 'বাঁচান বাঁচি' —ইহাই হইবে আমাদের একমাত্র মনোভাব। অন্য কথায় : আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই হইল মানুষের মৌলিক স্বভাব-ধর্ম। আল্লাহর সহিত নিবিড় যোগ রাখিয়া এবং সেই চিরশক্তির আধার হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া মানুষকে সব কাজ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত : বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ হইবে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উপর মানুষ কর্তৃত্ব করিবে—ইহাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ মানুষকে দিয়াছেন তাঁহার খলিফা বা রাজ-প্রতিনিধির (Vicegerent) মর্যাদা। কাজেই বিশ্বজগতে আল্লাহর নীচেই মানুষের স্থান। মানুষকে বলা হইয়াছে "আশরাফুল মাখ্‌লুকাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। ইহার

অর্থই এই যে, অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের তাঁবেদার। আল্লাহ্‌-তা'লা কোরান মজিদে সমগ্র সৃষ্টির উপরে মানুষের এই প্রভুত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন ঃ

"তিনি আবর্তনশীল সূর্যকে ও চন্দ্রকে এবং দিন ও রাত্রিকে তোমাদের অধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

—(কোরান, ১৪ ঃ ৩৩)

সৌরজগতের সবকিছুই তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে। চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস—মানুষের সেবা করিতে ও কথা শুনিতে আইনতঃ বাধ্য, কারণ ইহা যে আল্লাহরই কায়েমী হুকুম (standing order)। অন্যান্য ধর্মে চন্দ্র-সূর্য মানুষের দেবতা কিন্তু ইসলামে তাহারা পায়ের ভৃত্য। মানুষ সাধনা করিয়া শক্তি অর্জন করিলে সমগ্র জড়-প্রকৃতির উপর সে প্রভুত্ব করিতে পারে, এতবড় তার মর্যাদা।

তৃতীয়তঃ মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধে হইবে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ। "কানান্নাছো উম্মাতান ওয়াহেদাৎ" (সমস্ত মানবমণ্ডলী একজাতি) ইহাই কোরানের শিক্ষা। বস্তুতঃ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব (universal brotherhood) স্থাপনই যে ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। ইসলামের এক-বিশ্ব (one world) রচনা করিবে—ইহাই তাহার স্বপ্ন।

ইসলামের এই তিনটি মৌলিক ধ্যান ও আদর্শের সহিত কমিউনিজমকে মিলাইতে গেলে দেখা যায় ঃ বিসমিল্লাতেই গলৎ। আল্লাহর সহিত কোন সম্পর্ক কমিউনিজম স্বীকার করে না। বলা বাহুল্য, এই মৌলিক যোগসূত্র কাটিয়া দিলে অপর দুই সম্বন্ধও ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহকে মানিলেই তবে বিশ্বপ্রকৃতির উপর আমাদের অধিকার জন্মে এবং তখনই আসে মানুষে মানুষে সম-অধিকার বা ভ্রাতৃত্বের কথা। পিতাকে না মানিলে যেমন সন্তানেরা পরস্পর ভাই হয় না এবং তাহার

সম্পত্তি ও সম্পদে আইনতঃ কোন অধিকার জন্মে না, আল্লাহকে আমাদের সাধারণ উৎপত্তিস্থল বা স্রষ্টারূপে না মানিলে তেমনি আমাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ ও সৌরজগতের উপর আমাদের প্রভুত্বের কথা আসিতে পারে না। পিতার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়া যদি সমস্ত সন্তানের মধ্যে কোন মিল বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে তাহা হইয়া উঠে একটা বিদ্রোহমূলক দল গঠন আর আল্লাহর প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অর্থ হয় তখন জবরদস্তি করিয়া পিতার সম্পত্তি চুরি বা ডাকাতি করা। ইউরোপের জড়বাদমূলক সভ্যতাকে লক্ষ্য করিলে এই কথাই মনে জাগে। কমিউনিজম শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিতে চায় ঠিক এই মনোভাব লইয়া ; আল্লাহকে মানিবে না, কিন্তু তাঁর সম্পদ লুটিয়া লইবার জন্য সকলেই 'ভাই' হইব। এর চেয়ে জঘন্য নৈতিক অনাচার ও কৃতঘ্নতা আর কী হইতে পারে ? আজ যে বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছে এবং নানা আবিষ্কার দ্বারা জগতকে চমৎকৃত করিতেছে তাহাতে উল্লসিত হইবার কিছুই নাই ; লুটের মাল দ্বারা উপকার যে কিছু হয় না তাহা নহে, কিন্তু উপকার অপেক্ষা অপকার ও অনাচারই হয় বেশী। 'এটম বোমাই' ইহার প্রমাণ।

কাজেই আপাতঃদৃষ্টিতে কমিউনিজম বৈজ্ঞানিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এবং শ্রেণীহীন সমাজগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও তাহাতে উল্লাসের কিছুই নাই। ইসলামও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিতে চায়, কিন্তু সে আল্লাহকে অস্বীকার করিয়া নয়, আল্লাহর স্বীকৃতির উপরেই তার সব কিছুর বুনিয়াদ। কাজেই তিনটি মৌলিক সম্বন্ধের দুইটি যদিও কমিউনিজম মানিয়া চলিতেছে তবু ইসলামে ও কমিউনিজমে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

একজন চিন্তাশীল লেখক বলিতেছেন : "Communism is Islam minus Allah." অর্থাৎ কমিউনিজম হইতেছে আল্লাহবিহীন

ইসলাম। কথাটি খুবই সত্য। বলা বাহুল্য, আল্লাহবিহীন হইলে আর যতকিছুই হউক, সে অনৈসলামিক।

কমিউনিজ্‌ম যে আল্লাহ্‌ ও ধর্মের বিরোধী, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নাস্তিকতাই মার্কসবাদের প্রাণ, নাস্তিক না হওয়া পর্যন্ত মার্কসবাদ সম্যক বুঝা যায় না। লেলিনের লিখিত 'Religion' পুস্তকের গোড়াতেই আছে :

"Aetheism is a natural and inseparable part of Marxism. Marxism cannot be conceive without aetheism."

(অর্থাৎ : নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বুঝা যাইতে পারে না।)

লেনিন একস্থানে বলিতেছেন—"Down with Religion! Long live Aetheism. The dessimination of Aethist views is our chief task." (Religion, p. 19; অর্থাৎ ধ্বংস কর ধর্মকে, দীর্ঘজীবী হউক নাস্তিকতা, নাস্তিকতার প্রচারই আমাদের প্রধান কর্তব্য)।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যালিন-কনষ্টিটিউশনের ১২৪ ধারায় লিখিত আছে :

"Anti-religious propaganda is free, Religions propaganda not free. (Soviet Strength, by Hewlett Jahnson.)

(অর্থাৎ ঃ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করায় বাধা নাই ; কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচার করায় বাধা আছে)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ "The Marxist must be a materialist, i.e., an enemy of Religion." (Religion by Lenin, p. 21)

অর্থাৎ ঃ মার্কসবাদী হইতে হইলে তাহাকে জড়বাদী হইতেই হইবে, অর্থাৎ তাহাকে হইতে হইবে ধর্মের শত্রু।

নাস্তিকতাই ছিল তাই বলশেভিকদিগের রাজধর্ম। এই ধর্ম সর্বত্র প্রচারের জন্য রীতিমতভাবে আয়োজন করা হইয়াছিল। লেনিন যখন সেন্ট পিটার এবং সেন্ট পলের ক্যাথিড্রাল পরিদর্শন করিতে যান, তখন তথাকার প্রধান পুরোহিত এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে ক্রুশ লইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহা দেখিয়া লেনিন বলেন :

"Stop this buffoonery. The power of the working Classes comes from no gods, but from workshops, ploughs, from sweat of body! Enough of your fables about gods. We want no more of the opium which binds the will of the people. There are no gods on earth or in heaven."

অর্থাৎ ঃ—'আর তামাসা দেখাইও না। শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তি কোন দেবতাদিগের নিকট হইতে আসে নাই—আসিয়াছে কারখানা হইতে, আসিয়াছে লাঙ্গল হইতে, আসিয়াছে দেহের ঘাম হইতে। দেবতা সম্বন্ধীয় ঝুটা গল্প অনেক শুনিয়াছি, আমরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিবন্ধক ঐ আফিম আর খাইতে চাই না। ঈশ্বর বলিয়া পৃথিবীতে বা স্বর্গে কেহ নাই।"

কমিউনিস্টদের ধর্মনীতি সম্বন্ধে একজন লেখক বলেন ঃ—

"It excludes, and dogmatically excludes, the supernatural, whether this takes the form of the primitive belief in god and evil spirits of the more civilised reliance on a one omnipotent God (whether or not opposed by a Devil) involving the

immortality of all human beings destined for Heaven, Purgatory or Hell."

—(Soviet Russia, by Sidney & Web, p. 42)

অর্থাৎ :—কমিউনিজ্‌ম্ অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুই মানে না – তা সে আদিম যুগের ভাল-মন্দের দুই দেবতাতে বিশ্বাসই হউক অথবা আধুনিক যুগের মার্জিত কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসই হউক (সে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন শয়তান থাকুক বা নাই থাকুক) আর সেই সঙ্গে মানুষ যে অমর হইয়া স্বর্গে বা নরকে বাস করিবে, তাহাও সে মানে না।

অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় :—

"One of the most important tasks of the cultural revolution affecting the wide masses is the task of syste—matically and unswervingly combating religion—the opium of the people. The proletarian government must withdraw all state support from the Charch which is the agency of the former ruling class ; it must prevent all charch interference in State organised educational affairs, suppress the counter revolutionary activity of the ecclesiastical organisations on the basis of scientific materialism."

—(Program of the Communist International, p. 30)

অর্থাৎ :—জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতিগত বিপ্লব আনিবার পক্ষে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে রীতিমতভাবে বাধাদান করিতে হইবে—সেই ধর্ম, যাহা মানুষের পক্ষে আফিম বিশেষ। শ্রমিক গভর্ণমেন্ট কিছুতেই কোন গীর্জাকে রাজকীয় সাহায্য

দান করিবে না, কারণ গীর্জা হইতেছে পূর্ববর্তী শাসক-সম্প্রদায়ের সমর্থক। ষ্টেট-পরিচালিত যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের যেন কোন প্রভাব না থাকে। শিক্ষা ব্যাপারে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গীর্জা হইতে যদি কোন বিরুদ্ধ আন্দোলন আসে, তবে তাহা কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক জড়বাদই হইবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার ভিত্তি।

লেনিনের মৃত্যুর পর নাস্তিকতাই সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজধর্ম হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় :—

"It was some five years after the death of Lenin that a decree was issued (in may, 1929) giving atheism the status of a State dogma and granting to atheists the monopoly of the right to teach their belief. The Soviet Government soon after instracted the Commissar of Education to organise a special new inspectorate of anti-religious propaganda, with branches in all district centres, to superintend the enforcement of the New Law restricting the liberties of the Charch and forbiding all religious propaganda.

—(Pan-Islamism & Bolshevism—pp. 416-17)

অর্থাৎ ঃ—লেনিনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে (মে, ১৯২৯) নাস্তিকতাকে রাজকীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং নাস্তিকদিগকে নিজেদের মত প্রচার করিবার একচেটিয়া অধিকার দিয়া একটি রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়। অতঃপর সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই শিক্ষাসচিবকে ধর্মহীনতা প্রচারকল্পে একটি নূতন ইনস্পেক্টর বিভাগ খুলিতে নির্দেশ দেন। নানাস্থানে উহার শাখা স্থাপনেরও ব্যবস্থা

থাকে। উপরোক্ত নববিধান সর্বত্র চালু করা, গীর্জার স্বাধীনতা খর্ব করা এবং কোন প্রকার ধর্মবিষয়ক প্রচারণা যাহাতে কেহ না চালায় ইহারই তত্ত্বাবধান করা ছিল উক্ত বিভাগের উদ্দেশ্য।

কমিউনিজ্‌ম্ কোন নীতির ধার ধারে না। বিখ্যাত রুশ-গ্রন্থকার গর্কী এক সময় লেনিনকে প্রশ্ন করেন: আপনি কোন নীতি মানেন কি? লেনিন উত্তর দিয়াছিলেন:

"Who ever told you, Comrade, that I had principles or believed in morality?"

অর্থাৎ:—কে তোমায় কবে বলিয়াছে, বন্ধু, যে আমি কোন নীতি বা ধর্ম মানিয়া চলি?

অন্য আর এক সময় লেনিন বলিয়াছিলেন:—

"Get rid of your prejudices, Comrades Do not Worry about rights and wrongs."

অর্থাৎ:—বন্ধুগণ, তোমাদের ঐ সব কুসংস্কার বর্জন কর। ন্যায়-অন্যায় লইয়া অত মাথা ঘামাইও না।

ইহাই হইল কমিউনিজমের স্বরূপ। এরূপ মতবাদকে কোন মুসলমানই গ্রহণ করিতে পারে না—তা তার অন্য যত গুণই থাকুক। মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার জীবনের লক্ষ্য শুধুই খাওয়া-পরা এবং স্ফূর্তি করা নয়; এই দুনিয়ার সুখ-সুবিধাকেই সে একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করে না। তার অস্তিত্বের অণুপরমাণুতে ঝংকৃত হয় অসীম অনন্ত আকাশের সুর। তার মূল্যজ্ঞান (Sense of Value) অনেক উন্নত। সে জহুরী, কাচের চাকচিক্যে সে ভুলে না! ধ্রুবের সন্ধানী সে। তার পথ ভুল হয় না। তার উৎপত্তি এবং পরিণতি সম্বন্ধে সে সজাগ। "তোমরা আমা হইতেই আসিয়াছ এবং আমাতেই ফিরিয়া যাইবে"—আল্লাহ পরিষ্কারভাবে তাহাকে এ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। মুসলমান

জীবন-মরণ তাই আল্লাহকে কেন্দ্র করিয়াই পরিক্রমণ করে। সৌধ-নির্মাণ করিতে গেলে তার নীচে যেমন একটি সুদৃঢ় ভিত্তি থাকে, মুসলমানের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, তার রাষ্ট্র, সমাজ, জীবন ও মরণ—সকলেরই মূলে আছে তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস। ইসলামের মূল মন্ত্রই হইল: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" অর্থাৎ: এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই—মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রসুল।

ইহাই ইসলামের শিক্ষা। কাজেই আল্লাহকে বাদ দিয়া বা ধর্মকে বর্জন করিয়া তার কোন কাজই সম্ভব নয়। ভিত্তিহীন সৌধের মতই সে হয় একটা অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা বস্তু। কমিউনিজমের ব্যাপক অনুষ্ঠান দেখিলে তাই মনে হয়—এ যেন মস্তকহীন একটা বিরাটকায় জন্তু—যার হাত, পা, জবান সবই কাজ করিতেছে, কিন্তু সবকিছুই উদ্দেশ্যবিহীন, এলোমেলো।

যে নীতির উপর কমিউনিজ্‌ম্ আপন কাঠামোটি দাঁড় করাইয়াছে, তাহার সঙ্গেই বা এই নিরীশ্বরবাদ খাপ খায় কি করিয়া? ছোট ছোট সোভিয়েট লইয়া এক একটি রিপাবলিক, আবার সেই রিপাবলিকগুলি লইয়া একটি ইউনিয়ন এবং সেই ইউনিয়নের নিয়ামক হইতেছেন একজন ডিক্টেটর। ইহাই হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্র। বর্তমানে ষ্ট্যালিন হইলেন সেই ডিক্টেটর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে যাহা সত্য হইল, নিখিল বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহা সত্য হইল না! সেখানে আসিয়াই উহার ডিক্টেটরকে একদম অস্বীকার? এ যেন ঠিক ষ্ট্যালিন-হীন সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা এ যেন একটা বিরাট বিবাহ মহোৎসব, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ সবই হইল কিন্তু বর নাই।

সোশ্যালিজম কিসের জন্য? কমিউনিজ্‌ম কিসের জন্য? মানুষের প্রতি এই দরদ, এই সাম্য, এই মৈত্রী; এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের

পরিকল্পনা—কিসের জন্য ? সব কিছুই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়—যদি এর পিছনে আল্লাহর স্বীকৃতি না থাকে। কেন্দ্রবিহীন বৃত্তের ন্যায় আমাদের সব আয়োজন—সব আবর্তন ব্যর্থ হইয়া যায়। এক-পিতৃত্ব স্বীকার না করিলে যেমন ভায়ে-ভায়ে সদ্ভাব হইতে পারে না, সম-উৎপত্তিস্থল স্বীকার না করিলে তেমনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। এক আল্লাহ্ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সব মানুষই তাঁহার সৃষ্ট, কাজেই সব মানুষই ভাই-ভাই—ইহাই হইবে আমাদের যুক্তিসঙ্গত মনোভাব। একই উৎসমুখ স্বীকার করিলে তবেই আমরা পরস্পর সমান হইতে পারি। ইসলামের সোশ্যালিজ্‌ম ঠিক এই আদর্শেই গঠিত। আল্লাহ আমাদের একমাত্র প্রভু, বিশ্ব নিখিল তাঁরই সৃষ্টি, স্বর্গ-মর্ত্যের সব কিছুই তাঁর ; সব কিছুই আমাদের ভোগের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সকলে মিলিয়া সেই সম্পদ উপভোগ করিব এবং তাঁহারই গুণগান করিব—ইহাই ইসলামের শিক্ষা। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, ভালবাসা, হাম্‌দর্দী, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার—সবকিছু তখনই আসে—যখন আমরা আল্লাহকে মানি। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সেই চিরন্তন আদর্শকে বাদ দিলে আমাদের জীবন ও কর্মের কোনই অর্থ হয় না, মূল্যও হয় না। মানুষের অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে তাঁর অস্তিত্বের অনুভূতি নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু জড়-জীবনের ক্ষুধার তাড়নায় কমিউনিজ্‌ম্ সে অনুভূতিকে চাপা দিয়াছে।

জড়বাদীরা আজ আত্মাকে (spirit) অস্বীকার করিয়া জড়জীবনকেই চরম এবং পরম বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা তাহা নয়। কোরান বলিতেছে :—

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাহাকে (মানুষকে) সর্বাঙ্গসুন্দর করিলেন এবং তাহার (আল্লাহর) রুহ্ তাহার (মানুষের) মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন।"—(৩২ : ৯)

বাস্তবিকই তাই। জড় (Matter) এবং আত্মা (Spirit)—এই দুই-এর সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই মানুষ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। কমিউনিজম যখন একটিকে স্বীকার করিয়া অপরটিকে অস্বীকার করিতেছে, তখন ইহা যত ভালই হউক—ঠিক পূর্ণাঙ্গ নয়, একথা নিশ্চয়। ইহার গোড়াতেই রহিয়াছে মস্ত বড় গলৎ। মানুষের প্রকৃতির সহিত তার সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য থাকিতেই হইবে, অন্যথায় ইহা অস্বাভাবিক এবং অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

আর একটি কথা। জড়বাদ এখন বৈজ্ঞানিক জগতে অচল। ঈশ্বর (God) বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই জড়ের লীলাখেলা—এ মতবাদ বহু পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। Sir James Jeans প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একজন নিয়ন্তা আছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর সেই পুরাতন জড়বাদের ভিত্তির উপরেই কমিউনিজম দাঁড়াইয়া আছে। বিংশ শতাব্দীর নববিজ্ঞানের আলোকে কমিউনিজ্‌মকে পরীক্ষা করিতে গেলে ইহার বুনিয়াদ চুরমার হইয়া যায় না কি ? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' (Dialectic Materialism) হইতে যদি বস্তুবাদ (Materialism)-টুকুই মিথ্যা হইয়া যায়, তবে আর থাকে কি ? মার্কসবাদ (Marxism) যে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কমিউনিস্টরা এত ভড়ং করে, সেই গর্ব অলীক বলিয়া মনে হয় না কি ? সত্যই মার্কসের মতবাদ যে বিজ্ঞানসম্মত নয়, একথা এখন অনেকেই বলেন। 'Marxism—Is it Science ?' এই ধরনের প্রশ্ন পূর্বেই উঠিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরা দেখাইয়াছেন যে মার্কস যাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া চালাইতে চান, তাহাও মূলতঃ একটা বিশিষ্ট ধর্মমত বা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) কমিউনিজমের দার্শনিকতা অস্বাভাবিক এবং ইসলাম বিরোধী :—দুঃখ ও অভাবকে দূর করিয়া সকল মানুষকে

সুখী করা এবং প্রত্যেককেই তুল্য জ্ঞান করা—এই দুইটিই হইল কমিউনিজ্‌মের মূল লক্ষ্য। আপাতঃদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেশ্য খুব মহৎ বলিয়া মনে হয়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং মানুষের ভেদাভেদ দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করা খুবই বড় কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু কমিউনিজম যাহা বলিতে চায় বা যে-সংস্কার আনিতে চায়, তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সব মানুষকেই তুল্যরূপে সুখ-সুবিধা দান করিতে যাওয়া, অথবা সব মানুষকেই এক-সমান মনে করা নিতান্ত ভুল। প্রকৃতিতে এইরূপ সমতা নাই। ছোট-বড়, কম-বেশী ভাল-মন্দ, সুখী-দুঃখী—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সৃষ্টি-তত্ত্বের গোপন রহস্যই এইখানে। ছোটর পাশে বড়, সবলের পাশে দুর্বল, ধনীর পাশে দরিদ্র, আলোর পাশে অন্ধকার, সুখের পাশে দুঃখ—ইহাই আল্লাহর বিধান। আকাশে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই সমান নয়; জমিনে গাছ-পালা-পাহাড়-পর্বত-নদ-নদীকেহই সমান নয়। এমন কি একই গাছের ফলগুলিও পরস্পর সমান হয় না। জীবজন্তু, তরুলতা, কীট-পতঙ্গ কোনখানেই সমতার নীতি দেখা যায় না। মানুষ সবাই মূলতঃ সমান বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেরই অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধি-জ্ঞান বা শক্তি-সম্ভাবনা এক। সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক জিনিসেরই তারতম্য বা ইতর-বিশেষ আছে। কয়লা ও হীরক মূলতঃ এক, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা একই মূল্যে বিকায় না। নিখিল সৃষ্টির মূলে আছে বৈচিত্র্য বা বৈষম্য, এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই ঐক্য বা মিলনের সুর ধ্বনিত হইতেছে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই প্রত্যেক বস্তুটি নিজ নিজ স্থানে পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে। সবাই যদি সুখী হইত, তবে সুখ বলিয়া আমাদের মনে কোন ধারণাই জন্মিত না। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখকে বুঝি, সুখ আছে বলিয়াই দুঃখকে বুঝি। সেইরূপ ছোট না থাকিলে বড়কে বুঝা যায় না। অন্ধকার না থাকিলে আলোককে

বুঝা যায় না। একটির বিরুদ্ধে আর একটি দাঁড়াইয়া আছে, তাইত এই বিশ্বজগৎ এমন রূপ সুষমায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন পাথরই যদি নিজেকে চূর্ণ করিয়া দিয়া সুর্কী হইতে না চাহিত অথবা প্রত্যেক পাথরই যদি বলিত, আমি ভিত্তিমূলের নীচে পড়িয়া থাকিব না—আমি মিনারে উঠিব, তবে অমন সুন্দর তাজমহল আর গড়া হইত না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া মানুষের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র দাঁড়াইতেই পারে না।

দুঃখ-দৈন্যের দার্শনিক তত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেই এই সব অদ্ভুত মতবাদ দেখা দেয়। দুঃখের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারায় যেমন জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, দুঃখকে না বুঝিয়া উহার সমাধান করিতে যাওয়ায় তেমনি হইয়াছে কমিউনিজমের সৃষ্টি। সুখ ও দুঃখের কোন মাপকাঠি নাই। আমার নিকট যাহা দুঃখ, অপরের নিকট তাহা দুঃখ নহে, আমি যাহাকে অভাব মনে করি অপরে তাহাকে অভাব নাও মনে করিতে পারে। আবার যেটাকে আমি দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছি, সেটাই বৃহত্তর কোন কল্যাণের উৎস-মুখ হইতে পারে। মনে করুন, কলিকাতা হইতে দেশে যাইব বলিয়া ঢাকা মেল ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম; কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের জন্য টিকিট করিতে না পারায় গাড়ী ফেল করিলাম। মনে বড়ই দুঃখ হইল যে, সেদিন বাড়ী যাইতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিন সকালেই যদি খবরের কাগজে দেখা যায় যে, সেই ঢাকা-মেলেই ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং বহু লোক হতাহত হইয়াছে, তবে অমনি খুশিতে বুক ভরিয়া উঠিবে এবং বারে বারে খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিব যে, কাল ট্রেনটি ফেল করাতেই আজ বাঁচিয়া গিয়াছি। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আমাদের সুখ-দুঃখের কোন চিরস্থির মাপ-কাঠি নাই। একটু পূর্বে যাহা দুঃখ বলিয়া মনে হয়, একটু পরে তাহাই আনন্দের কারণ হইয়া উঠে। আজ যেটাকে খুব সুখের

বলিয়া মনে করিতেছি ; হয়ত উহাই দু'দিন পরে পরম অকল্যাণ রূপে দেখা দিবে। অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া মানুষ তাই কোন্‌টি প্রকৃত সুখ, কোন্‌টি প্রকৃত দুঃখ, কিছুই বুঝিতে পারে না।

ইহাই যখন মানুষের অবস্থা, তখন মানুষ কোন্ সাহসে মানুষের সমতা বিধান করিতে চায় ? আল্লাহ্‌ যাহা করেন নাই, মানুষ কেমন করিয়া তাহা করিবে ?

মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তালা কী বলিতেছেন, দেখুন ঃ

"নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে দুঃখ-কষ্টে ফেলিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।"—(কোরান, ৯ ঃ ৪)

"আমরা নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কখনও কখনও ভীতি, অনশন, সম্পদহানি, প্রাণহানি অথবা শস্যহানি দ্বারা পরীক্ষা করিব এবং ধৈর্যশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।" —(কোরান, ২ ঃ ১৫৫)

"মানুষেরা কি মনে করে যে 'আমরা বিশ্বাসী' এই কথা মুখে বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং পরীক্ষা করা হইবে না ? নিশ্চয়ই তাহাদের পূর্বে যাহারা গিয়াছে, তাহাদিগকেও আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। অতএব আল্লাহ্‌ অবশ্যই জানিয়া লইবেন কাহারা সত্যবাদী এবং কাহারা মিথ্যাবাদী।"

—(কোরান, ২৯ ঃ ২-৩)

"নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত সুখ আছে ; কষ্টের সহিত নিশ্চয়ই সুখ আছে।" —(সুরা ইনশেরাহ; ৫-৬ আয়েত)

দুনিয়ার প্রাচুর্য যে মানুষের নৈতিক অধঃপতন আনিতে পারে, সে সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌ এই সতর্কবাণী পাঠাইয়াছেন ঃ—

"দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমাদিগকে বিপথগামী করে।"

—(কোরান, ১০২ ঃ ১)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার কোনই মূল্য নাই। মানব-জীবনে দুঃখেরও আয়োজন আছে ;

ইহা আল্লাহরই বিধান। দুঃখ-কষ্টকে একদম তুলিয়া দিবার পরিকল্পনা তাই বাতুলতা মাত্র। ইহা খোদার উপরে খোদকারী ছাড়া কিছু না। ভাত-কাপড়ের কষ্ট এই প্রকারে নিবারিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাইত মানুষের প্রকৃত সুখ নয়! দুঃখ বহুরূপী ; সহস্র পথে তার আনাগোনা। এক দুয়ার বন্ধ করিলে অন্য দুয়ার দিয়া সে আসে। কে তাহাকে রুদ্ধ করিবে ?

বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন কোথাও সমতা দেখা যায় না, মানুষের বুদ্ধি বা রুচির মধ্যেও তেমনি সমতা নাই। একই ঘরের একই বয়সের দুইটি ছেলেকে একই সুযোগ ও সুবিধা দিয়া শিক্ষা দিলেও দেখা যাইবে, উভয়ের গঠন স্বতন্ত্র হইয়াছে। কমিউনিজম এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে স্বীকার করে না, কাজেই ইহা অস্বাভাবিক।

(৩) **কমিউনিজম ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী ঃ—** কমিউনিজম মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে হরণ করিয়াছে। মানুষকে সে করিয়াছে একটা যন্ত্র-বিশেষ। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় মানুষ কিছুই করিতে পারে না ; সব সময়েই তার মনের উপর একটা নিয়মতন্ত্রের বোঝা চাপিয়াই আছে, প্রশান্ত অবসর বা সহজ মনের সহজ আনন্দ কোনদিনই সে পায় না, একটা কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে সব সময়েই পীড়া দেয়। ঈশ্বর ও দেবদেবীকে তুলিয়া দিলেও 'স্টেট' এবং 'ডিক্টেটরই' এখন কমিউনিস্টদের ঈশ্বর। লেনিনকে সত্য সত্যই তাহারা পূজা করে।

কমিউনিজম চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে সে একই ধরনের চিন্তা করায়। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে regimentation. ইহা নিশ্চয়ই বুদ্ধির এবং চিন্তার বন্ধন, সন্দেহ নাই।

কোন ধনরত্ন কেহ সঞ্চয় করিতে পারিবে না, স্টেট হইতে সকলেরই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হইবে, এ বিধানও বেশী দিন টিকিতে

পারে না, কারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। মানুষ স্বভাবতঃই সঞ্চয়-প্রয়াসী ; কোন কিছু উপার্জন করিয়া সে তাহা নিজের বলিয়া দাবী করিতে ভালবাসে। কমিউনিজম এই সহজাত প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, ফলে মানুষের জীবন হইয়া উঠিয়াছে একটা প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ। সৃষ্টির উল্লাস তাহার নাই, মনের স্বাধীন গতিবিধির আনন্দ তাহার নাই। নিজে সে স্বাধীনভাবে কোন কিছু সঞ্চয়ও করিতে পারিবে না, ব্যয়ও করিতে পারিবে না—ইহা মানুষের পক্ষে এক মস্ত বড় অভিশাপ। মানুষের অন্তরে যে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা আছে, নব নব পথে আত্মপ্রকাশ করিবার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে, কমিউনিজম তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। একটা স্বাধীন জীবন্ত মানুষের মনের উপর এরূপ নৈতিক জবরদস্তি আর দেখা যায় না।

(৪) ইসলামে পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় ঃ—কমিউনিজম চায় জগৎ হইতে পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিতে। কিন্তু ইসলামে এরূপ বিধান নাই। স্টেট্‌ বা অন্য কোন রাজশক্তি আসিয়া ধনীদিগের ধন ও সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে, এ বিধান সঙ্গত নয়। পুঁজিবাদ যে থাকিতে পারিবে না, অথবা সঞ্চয় করিলেই যে সে ঘোর অপরাধী হইবে, ইসলাম ইহা বলে না। নিজে চেষ্টা করিয়া যত পার অর্থ সঞ্চয় করিতে পার, সেই অর্থ হইতে দীন-দরিদ্রের সেবায় এবং অন্যান্য সৎকর্মে দান কর—ইহাই ইসলামী ফরমান। এই বিধানই কি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়? পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের কী চমৎকার সমন্বয় এ!

পুঁজিবাদ যে সর্বদা নিন্দনীয়, তাই বা কে বলিল? কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদের নাম শুনিতে পারে না। তাহারা বলে ঃ পুঁজিবাদে গরীবকে শোষণ করিয়া ধনীরা আরো বড় লোক হয় এবং সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপদ্ধতি না থাকায় জাতির অনেক শক্তি বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অর্থনৈতিক প্রণালী (Economic system) হিসাবে পুঁজিবাদও অতি চমৎকার ব্যবস্থা। সাম্যবাদীরা জাতীয়করণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ (Nationalisation and planning) পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া এই সত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অর্থনীতির এ পথও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন নয়। জাতীয়করণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা জাতির আর্থিক সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা জাতি যতটা না লাভ করে, তার চেয়ে হারায় বেশী। এইরূপ কার্যক্রমের ফলে মানুষের বহু উদ্ভাবনী শক্তি ও নব নব সৃষ্টির কৌতূহল থামিয়া যায় ; সেই সঙ্গে আরো অনেক সুবৃত্তিও চাপা পড়িয়া মরিয়া যায়। কাজেই লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিলে দেখা যায় ঃ—ক্ষতির অঙ্কই বড় হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যাহা হারায়, তার মূল্য ভাত-কাপড়ের সুখ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি। খাবার জন্যই মানুষ বাঁচে না, বাঁচার জন্যই খায়।

তাছাড়া পুঁজিবাদের যে-সব দোষত্রুটি কমিউনিস্টরা দেখায়, তাও এখন বহুলাংশে সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। সাম্যবাদীদের চীৎকারের ফলে পুঁজিপতিরা এখন অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় সর্বত্রই এখন শ্রমিক সংঘ (Labour Union) স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের অনেক সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে। 'বিভারিজ' পরিকল্পনা (Beverige plan), বোনাস দান, শ্রমিক-দিগের বেতন বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাস, ছুটি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধা দানই তাহার প্রমাণ।

পুঁজিবাদ দুনিয়ার আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে এ-ব্যবস্থার চমৎকার মিল আছে। যে কোন মানুষ সহজেই এই পথে নিজের কর্মশক্তিকে যে-কোন দিকে কার্যে লাগাইতে পারে। ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমাজে ব্যাপক অর্থ সঞ্চালনের পক্ষে

এ ব্যবস্থা অতি উত্তম। সামান্য কিছু পুঁজি পাইলেই মানুষ ছোট-খাটো ব্যবসা করিয়া উপার্জন করিতে পারে। অনেকে তাই পুঁজি-বাদকে এখনও শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রণালী (best economic plan) বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন ঃ—কাজে লাগাইবার পক্ষে এই প্রথা অত্যন্ত সহজ এবং এই জন্যই সমাজ-কল্যাণকর। পুঁজিপতিরা যদিও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই তাহাদের টাকা খাটায় এবং যথেষ্ট লাভ করে, তবুও তার মধ্য দিয়াও সকলের অলক্ষ্যে দেশের সেবা ও জনকল্যাণই সাধিত হয়। যে জিনিসের যেখানে অভাব, পুঁজিপতিরা গরজ করিয়া সেই জিনিস অন্যস্থান হইতে সেখানে আমদানি করে বা উৎপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা নিজেরা যথেষ্ট লাভ করিলেও সমাজের অভাব-অভিযোগই যে তাহারা মিটায় এবং সামাজিক সুখই যে তাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? টাকা খাটাইতে গিয়া বহু বেকার লোককেও তাহারা উপার্জন করিবার সুযোগ দেয়। এই-রূপে কোন এক অদৃশ্য শক্তি (invisible hand) দ্বারা চালিত হওয়ায় পুঁজিবাদ দ্বারাও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Adam Smith পুঁজিবাদের দোষগুণ আলোচনা করিতে গিয়া বলেন:

"Every individual is continually exerting himself to find out the most advantageous employment for whatever capital he can command. It is his own advantage and not that of the society, which he has in view but the study of his own advantage normally, or rather necessarily leads him to prefer that employment which is most advantageous to the society. By directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value,

he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest frequently, he promotes that of the society more effectively than when he really intends to promote it."

—(Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book IV, Chapter, 2.)

অর্থাৎ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পরিমাণ অর্থ তার আছে, সেই পরিমাণে সবচেয়ে লাভজনক কাজ খুঁজিয়া ফেরে। অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই সে ইহা করে, সমাজের স্বার্থের কথা সে ভাবে না। কিন্তু তার নিজের স্বার্থের চিন্তা করিতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই অথবা প্রয়োজনের তাগিদেই সে এমন কাজ পছন্দ করিয়া লয়, যাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।...উৎপাদন যেরূপ হইলে তাহার বেশী লাভ হইবে, নিজ স্বার্থের খাতিরে সে সেইরূপভাবেই তাহার শিল্পকে চালনা করে বটে, কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া সে এমন এক উদ্দেশ্য সাধন করে, যাহা গোড়ায় সে চিন্তা করে নাই। এই উদ্দেশ্য গোড়াতে না থাকার দরুন যে সব সময় খুব খারাপই হয়, তাও নয়। অনবরত নিজের স্বার্থ খুঁজিতে গিয়া সমাজের স্বার্থও সে এমনভাবে সিদ্ধ করে যে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোন সামাজিক কাজ করার চেয়েও তার ফল ভাল হয়।

পুঁজিবাদের দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু সে দোষ শুদ্ধ হইলেই ইহার বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না। একজন বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ তাই বলিতেছেন ঃ

"A large body of economists, however, still maintain that the system (capitalism) should not be unduly interfered with, and that, left to work for itself with the minimum of control, it is still capable of providing the maximum happiness of the maximum number."

—(Economics of Islam, p.5.)

অর্থাৎ—একদল অর্থনীতিবিদ এখনও মনে করেন যে ; পুঁজিবাদ প্রথাকে অনর্থক বিব্রত করা উচিত নয়। যথাসম্ভব কম বাধা দিয়া ইহাকে চালু রাখিলে ইহা এখনও বেশী সংখ্যক মানুষকে বেশী পরিমাণ সুখ দান করিতে পারে।

পুঁজিবাদ কথাটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার জন্য ইউরোপের বিকৃত অর্থনৈতিক কাঠামোই দায়ী। ধনপতিরা অত্যধিক লাভের আশায় শ্রমিকদিগের উপর সত্যই নানাভাবে জুলুম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মজুরদিগকে তাহারা অতিরিক্ত সময় খাটাইত, সস্তায় বেশী কাজ পাবার আশায় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে কাজে লাগাইত, তাহাদের রোগ হইলে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করিত না, উপযুক্ত আহার দেওয়া হইত না, কুলি মজুরদের কেহ মারা গেলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ বা লেখা-পড়ার কোন বন্দোবস্ত হইত না—এইরূপ ধরনের আরও অনেক অসুবিধা ও দোষত্রুটি পুঁজিবাদের সহিত জড়িত ছিল।

কিন্তু বর্তমানে পুঁজিপ্রথা উপরোক্ত দোষত্রুটি হইতে অনেকখানি মুক্ত। ফ্যাক্টরী-আইনে কুলি-মজুরদের কাজের সময় বাঁধিয়াও দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে কাজে লাগান হইয়াছে। উন্নত ধরনের কুলি লাইন স্থাপন করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা হইয়াছে ; মৃত মজুরদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা

রহিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন খুলিয়া অথবা ধর্মঘট করিয়া শ্রমিক দলও নিজেদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াইয়া লইয়াছে। অনেক স্থলে বোনাস প্রবর্তিত হইয়াছে। কাজেই পুঁজিপতিদের যতটা দোষ ছিল, আর ততটা নাই। পুঁজিবাদ ও শ্রমবাদের মধ্যে এইরূপে সর্বত্রই একটা আপোষের মনোভাব দানা বাঁধিতেছে।

ইসলাম তাই মধ্যপন্থী। ধন-উপার্জনে তার বাধা নাই, কিন্তু নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদিগকে বঞ্চিত করিয়া সেই ধন সে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। নিজে বড় হও, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য কর এবং তাহাদের বড় হইবার সুযোগ দাও, দেশ ও জাতির সেবায় সেই অর্থ ব্যয় কর—ইহাই ইসলামের নীতি।

ইসলামে তিন উপায়ে ধন-সম্পত্তি লাভ করা যায় : (১) উপার্জন দ্বারা, (২) উত্তরাধিকারসূত্রে, (৩) দানসূত্রে। কত পর্যন্ত ধন-সম্পত্তি মজুত করা যায়, ইসলাম তাহার কোন সীমা-নির্দেশ করে নাই। যাহার যত খুশী, উপার্জন করিতে পারে। রাশি রাশি স্বর্ণ বা মণি-মাণিক্যও একজনের অধিকারে থাকিতে পারে। কোরান বলিতেছে :—

"এবং তোমরা যদি কেহ তাহাদের (স্ত্রীলোকদের) কাহাকেও পর্বত প্রমাণ স্বর্ণ ও যৌতুক দান কর, তাহা হইলেও তাহা হইতে কিছু ফিরাইয়া লইও নয়।" (৪ : ৭)

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তুল্যরূপে ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে কোনই বাধা নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে কমিউনিজমের সহিত ইসলামের মতভেদ আছে। ইসলামের হজ, জাকাত, ফিৎরা, দেন-মহর ও উত্তরাধিকার আইন প্রমাণ করে যে, ধন-সম্পত্তিতে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অধিকার আছে এবং ধন-সঞ্চয়ে কোন বাধা

নাই। ধন-সম্পত্তির হস্তান্তর বা অসিয়ৎ করিবার ক্ষমতাও ইসলাম প্রত্যেককে দিয়াছে। কোরান বলিতেছে :—

"মৃত্যুকালে ধন-সম্পত্তির অসিয়ৎ উইল করা তোমাদের জন্য জায়েজ করা হইল—তোমাদের মাতাপিতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি—ন্যায্য দেশাচার অনুযায়ী।" (২ : ১৮০)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—আয়ের বা উৎপন্নের দিকে ইসলাম কোন সীমা নির্দেশ করে নাই ; এ-পথ একদম খোলা। শুধু বিতরণের দিকেই বিধি-নিষেধের বেড়া আছে। উৎপাদন বা সঞ্চয় করিতে পারিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিতরণও করিতে হইবে, ইহাই ইসলামের নির্দেশ।

(৬) ধন সম্পত্তির তারতম্য আল্লাহরই বিধান :—ইসলামে ধনসম্পত্তির তারতম্য স্বীকার করে। কোরান বলিতেছে :

"তিনিই (আল্লাহই) তোমাদিগকে ভূসম্পত্তিতে অধিকারী করিয়াছেন এবং একজনকে অপর অপেক্ষা বিভিন্ন ক্রমে বড় করিয়াছেন, যাহাতে তিনি তাঁহার দান সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন। এবং তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পদমর্যাদায় একজনকে অপরজন অপেক্ষা বড় করিয়াছেন।" —(৬ : ১৬৫-১৬৬)

"আল্লাহ্ যাহাকে খুশি তাহারই রুজি (উপার্জন) বাড়ান বা কমান এবং তাহারা এই দুনিয়াদারীতেই আনন্দ পায় ; কিন্তু এই দুনিয়ার জীবন পরলোকের তুলনায় ক্ষণিক সুখের ছাড়া আর কিছুই নয়।" —(১৩ : ২৬)

"এবং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে অপর লোক অপেক্ষা উপার্জনের দিক দিয়া বড় করিয়াছেন।" —(১৬ : ৭১)

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহারই রুজি (উপার্জন) প্রচুর বাড়াইয়া দেন এবং তিনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করেন।" —(১৭ : ৬০)

"তারা (লোকেরা) কি কখনও তোমার প্রভুর দয়া ভাগ করিয়া দিতে পারে? আমরাই দুনিয়ার সম্পদ তাহাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেই। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহার অপেক্ষা মর্যাদায় বড় করি। যাহাতে কেহ অপরের উপর হুকুম করিয়া কাজ করাইতে পারে। কিন্তু তোমার প্রভুর দয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।" (কোরান, ৪৩ : ৩২)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে এ-কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অর্থ-সম্পদের বা পদমর্যাদার কোন সমতা হইতে পারে না। কেহ ধনী, কেহ নির্ধন ; কেহ বড়, কেহ ছোট—ইহা থাকিবেই, কারণ ইহাই আল্লাহর বিধান। এই বিধানকে তুলিয়া দিয়া মনগড়া কোন সাম্য আনিতে গেলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

(৭) দৈহিক সুখ-ভোগই ইসলামের একমাত্র কাম্য নয় :—অন্ন-বস্ত্রের সুখ-সুবিধাই কমিউনিজম্ আজ বড় করিয়া দেখিতেছে, কিন্তু মানুষের আত্মিক ক্ষুধার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। ভাত কাপড়ের কথা ছাড়াও আমাদের আরও অনেক কিছু ভাবিবার আছে! আমরা শুধু খাইবার জন্য আসি নাই—আমাদের জীবনের লক্ষ্য উচ্চতর! কাজেই কমিউ নিজমের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ইসলামের দৃষ্টি-ভঙ্গী মিলে না। ইসলাম ইহলোকের সম্পদও যেমন চায়, পরলোকের সম্পদও ঠিক তেমনই চায়। প্রত্যেক মুসলমান প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করে, "রব্বানা আতায়না ফিদ্-দুনিয়া হাসানাতা ওয়া বিল আখেরাৎ" (অর্থাৎ : হে প্রভু! দুনিয়া ও আখেরাতে যাহা আমাদের কল্যাণকর, তুমি তাহাই আমাদিগকে দাও।)

ইসলামের সহিত কমিউনিজমের এইরূপ বহু পার্থক্যই বিদ্যমান।

কমিউনিজ্‌ম্ না ইসলামিজ্‌ম্ ?

এতক্ষণ আমরা কমিউনিজ্‌ম্‌কে দেখিলাম, ইসলামকে দেখিলাম। এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে ঃ কোন্‌টি টিকিবে ? কোন্‌টি জিতিবে ? কমিউনিজ্‌ম্ না ইসলামিজ্‌ম্ ?

এ কথা দৃঢ়তার সহিতই বলা যায় ঃ ইসলামের নিকট কমিউনিজ্‌ম্‌কে সর্বশেষে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। ইসলামিজ্‌ম্‌ই হইবে কমিউনিজ্‌মের শেষ পরিণতি। সোশ্যালিজ্‌ম্, ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ইত্যাদি জগতে যতপ্রকার 'ইজ্‌ম' (isms)-এর সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তগুলি আসিয়া মিলিত হইবে ইসলামের শান্ত শীতল বুকে। জগৎ জুড়িয়া আজ যে-সব সমস্যা নানারূপে দেখা দিয়াছে, প্রত্যেক জাতিই সেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া ফিরিতেছে ; কিন্তু কেহই একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ (well balanced) বিধান দিতে পারিতেছে না। প্রকৃত রোগ-নিরূপণ করিয়া ঔষধ দিতে না পারিলে যেমন রোগী আরোগ্য লাভ করে না, জগতের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইতেছে। আসল একটা রোগ তার অন্তরে ঢুকিয়াছে, সেই রোগের বহু লক্ষণ (symptoms) নানাভাবে নানা অঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। আনাড়ী ডাক্তারেরা যেখানে যে লক্ষণটি দেখিতেছে, সেই লক্ষণটিকেই একটি স্বতন্ত্র রোগ মনে করিয়া তাহার ঔষধ দিয়া ফেলিতেছে। ফলে এক অঙ্গ হইতে রোগটি সরিয়া গিয়া বা চাপা পড়িয়া অন্য অঙ্গে অন্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যে-রোগীর আজ একটু জ্বর, কাল একটু মাথাব্যথা, পরশু একটু কাশি, সকালে একটু পেটের অসুখ, বিকালে একটু বুকজ্বালা, রাত্রিতে অনিদ্রা, সেই রোগের রোগ-চিকিৎসা ওরূপ করিয়া হয় না। অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ যেমন সুনির্বাচিত একটি ঔষধের একটি ফোঁটা

দিয়াই সমস্ত উপসর্গকে শান্ত করিয়া থাকেন, ইসলামও ঠিক সেইরূপ একটা দাওয়াই দিয়াছে। অসুস্থ দুনিয়ার সমস্ত উপসর্গকে দূর করিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার স্পর্ধা সে রাখে। সমস্ত বৈষম্যের শান্তি বা সমন্বয় তার কাছে আছে বলিয়াইত তার নাম শান্তি ধর্ম।

ইসলাম কেমন করিয়া সমস্ত বৈষম্যের সমন্বয় করিতে পারে, কমিউনিজমের ভাষাতেই তাহা বুঝা যায় ঃ

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism)-ই হইতেছে কমিউনিজমের ভিত্তিমূল। কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঘটে না, একটির সহিত আর একটি জড়িত থাকে, একটি হইতে আর একটি উদ্ভূত হয়। কাজেই কোন ঘটনাকে বুঝিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিতে হয় এবং তাহার বিভিন্ন দিক দেখিতে হয়। ইহাই ডায়লেকটিক পদ্ধতি।

আবার প্রত্যেক বস্তু বা ধারণার সঙ্গে তার একটা দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধ ভাবও বিদ্যমান থাকে। এই দ্বন্দ্বভাবের মধ্যে দিয়াই আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশ হয়। তরলকে বুঝিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কঠিনকেও বুঝিতে হয়, আধার দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে আলোকের ধারণাও মনে জাগে। সেইরূপ বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র, স্বামী-স্ত্রী, রাজা প্রজা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি ধারণাগুলি দ্বন্দ্বমূলক। একটি বলিলেই তাহার বিপরীতটিকেও বুঝিতে হয়। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ধারণার সঙ্গে অপর ধারণার এই বৈষম্য বা দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। এই সব বৈষম্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে তাহারই ফলে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা স্ফুরিত হইতেছে।

পরস্পরবিরোধী বস্তু বা ধারণার মধ্যে শুধু যে সংঘর্ষই চলিতেছে তাহা নহে ; এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একটা ঐক্যের সুরও ধ্বনিত হইতেছে। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে তাই আছে একটা মিল-সূত্র। এই যে হ্যাঁ-না এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, ইহাকেই কমিউনিজ্‌মের

পরিভাষায় বলা হইয়াছে 'thesis, antithesis ও synthesis' অর্থাৎ প্রস্তাবনা, বৈপরীত্য এবং সমন্বয়। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বস্তু এইরূপ স্বতন্ত্র হইয়াও মিলিতরূপে প্রকাশ পায়। ইহাকেই বলে বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন (unity in diversity).

উপরে আমি এই সমন্বয়ের কথাই বলিয়াছি। ক্যাপিটালিজ্‌ম্, ফ্যাসিজ্‌ম্, নাৎসিজ্‌ম্, বলশেভিজ্‌ম্, সোশ্যালিজ্‌ম্, কমিউনিজ্‌ম্ ইত্যাদি সমস্ত ইজমই খণ্ড খণ্ড রূপে কোন কোন সমস্যার সাময়িক সমাধান করিয়াছে মাত্র। সমস্ত খণ্ড সমাধানের মধ্যেও আবার বিরোধ ও বৈষম্য আছে, সেগুলির মধ্যেও ত একটা সমন্বয় (synthesis) চাই! এই খণ্ড সমন্বয়গুলিকে মহাসমন্বয়ে মিলাইয়া দিবে কে?—ইসলাম। বিভিন্ন নদী যেমন ছোট ছোট জল-ধারাকে একসঙ্গে মিলাইয়া নিজেরা পুনরায় সমুদ্রের গর্ভে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনি জগতের সমস্ত মতবাদ ও ব্যবস্থা-প্রণালীকে এক মহাসত্যের বুকে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হইতেই হইবে। ইসলামই সেই ultimate synthesis বা চরম সমন্বয়।

কমিউনিজ্‌মের ভাষায় এই দ্বন্দ্ব ও মিলনের নাম "Conflict and unity of Opposites" অর্থাৎ বিপরীত বস্তুদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ ও সমন্বয়। ইহাকে 'doubleness of the single' (একে দুই)-ভাবও বলা হইয়া থাকে। সমস্ত বস্তুর মূলে যে সত্যই একটি দ্বিত্ব ভাব আছে, এ কথা মিথ্যা নয়। ইসলামও এ কথা স্বীকার করে। কোরান শরীফে আল্লাহ বলিতেছেন:

"সোব্‌হানাল্লাজি খালাকাল্ আজওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তোম্‌বেতোল্ আবদো ওয়া মিন আন্‌ফোসেহিম্ ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামুন।"

অর্থাৎ: "সেই আল্লাহর মহিমা—যিনি পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা তাহারা (মানুষ) জানে না—এমন সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায় (in pairs) সৃষ্টি করিয়াছেন।—(কোরান, ৩৬: ৩৬)

ইহাই হইল জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ইসলামের কথা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হ্যাঁ-না, আলো-আঁধার, দিবা-রাত্র, দীন-দুনিয়া, আকাশ-পৃথিবী, দোজখ-বেহেশত ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিষই এইরূপ জোড়া বাঁধা। শুধু বাহিরের চক্ষে নয়, এমন কি পদার্থের মূলে গিয়াও বৈজ্ঞানিকেরা দেখিতে পাইতেছেন—এই দ্বৈতভাব। তাঁহারা বলিতেছেন, সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ, আর এই বিদ্যুৎ হইতেছে দুই প্রকারের: ইলেকট্রোনস (Electrons) এবং প্রোটনস (Protons)। ইলেকট্রোন ঋণাত্মক বা না-মূলক (negative) বিদ্যুৎ, আর প্রোটন হইল ধনাত্মক বা হ্যাঁ-মূলক (positive) বিদ্যুৎ। ইহাদিগকে স্ত্রী এবং পুরুষ বিদ্যুৎও বলা যাইতে পারে। পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুতে এই দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের মিলন বা সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে কেহই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নাই—জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়া আছে।

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কমিউনিজ্‌ম্ যে বৈষম্যের মধ্যে মিলনের কথা (unity of opposites) বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে।

কিন্তু তাহা হইলেও এ বিষয়ে ইসলামের ধারণায় ও কমিউনিজ্‌মের ধারণায় পার্থক্য প্রচুর। এই মহাসত্যকে কমিউনিস্টরা বিকৃতভাবে নিজেদের কাজে লাগাইতেছে। তাহারা বলিতেছে: পুঁজিবাদকে (Capitalism) ধ্বংস করিয়া আমরা আনিব সাম্যবাদ (Communism)। ইহা যে কোন্ যুক্তিবলে সিদ্ধ হইতে পারে, বুঝা কঠিন। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তবে একটিকে কাটিয়া অপরটিকে গ্রহণ করিবে কেন? ডায়লেকটিক পদ্ধতি একথা

বলে না। দুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে না, অথচ তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে ইহাই হইল ডায়লেকটিক। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোথায় তাহা হইল ? Capitalism-কে ধ্বংস করিয়া Communism-এর প্রতিষ্ঠা করিব—এ কথা বলিলে রাত্রিকে ধ্বংস করিয়া দিনকে রাখিব বলার মতই শোনায়। ইহা ডায়লেকটিক পদ্ধতির খেলাফও বটে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধও বটে। 'একদিন' বলিলে শুধু প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা সময়কেই বুঝায় না, রাত্রির ১২ ঘণ্টাকেও বুঝায়; দিন-রাত্রির আলো-আঁধারকে মিলাইয়াই একটা গোটা দিন হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখ, জড়-চেতন, ছোট-বড়, ভাল-মন্দ, ধনী-নির্ধন—ইত্যাদির কোন একটিই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না, একটির পাশে আর একটি থাকিবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহাই আল্লাহর বিধান। প্রত্যেক জিনিষটিকেই তিনি ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আর একটা বিপরীত-ধর্মী বস্তুর বৈষম্য দ্বারা। দুঃখ না থাকিলে যেমন সুখকে বুঝা যায় না, অথবা সুখ না থাকিতে যেমন দুঃখকে বুঝা যায় না, সেইরূপ দরিদ্র না থাকিলে ধনীকে বুঝা যায় না এবং ধনী না থাকিলে দরিদ্রকেও বুঝা যায় না। প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে, প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্থান ও কর্তব্য আছে। পর্যায়ক্রমে তাহারা যাওয়া-আসা করে, কেহই কাহাকেও গ্রাস করে না। এ-সম্বন্ধে কোরান কী সুন্দর ভাবেই না বলিতেছে ঃ

"সূর্য চাঁদকে ধরিতে পারে না, রাত্রিও দিনের নাগাল পায় না, সকলেই মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" —(৩৬ ঃ ৪০)

সুখ ও দুঃখের দিনগুলিও সেইরূপ পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে আসে। এ-সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে ঃ

"এবং আমরা পর্যায়ক্রমে এই (সুখ-দুঃখের) দিনগুলি মানুষের মধ্যে আনিয়া থাকি, যাহাতে আল্লাহ্‌ মানুষকে জানিতে (পরীক্ষা করিতে) পারেন।" —(৩ ঃ ১৩৯)

অতএব আমরা দেখিলাম, ক্যাপিটালিজম এবং কমিউনিজম—এই দুই বিপরীতমুখীন শক্তিরও একটা আপোষ বা সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। কমিউনিষ্টরা পুঁজিবাদকে যদি একদম উড়াইয়াই দিল, তবে আর 'ডায়লেকটিক' রহিল কোথায় ? বিশ্ব-প্রকৃতিতে যেমন একজাতীয় সমান বস্তু নাই, তেমনি সমাজ গঠনের মধ্যেও শুধু একজাতীয় জীব থাকিতে পারে না ; ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সব রকমের লোকেই থাকিবে। ইহাই প্রকৃত সাম্যবাদ। বৈষম্যগুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া একটিকে বাঁচাইয়া রাখার নাম সাম্য নহে।

কমিউনিষ্টরা বলে ঃ পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কমিউ-নিজ্‌মে। তাই যদি হয়, তবে কমিউনিজ্‌মের পরিণতি কিসে ? এ কথার তাহারা জবাব দিক।

কমিউনিজ্‌ম্‌ শুধু জড়বাদের উপর বেশীদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। জড়ের বিপরীত বস্তু (antithesis) হইল চৈতন্য (spirit) : জড় ও চৈতন্যের সমন্বয়েই (synthesis) আমাদের জীবন। কাজেই শুধু জড়ের ভিত্তির উপরে আমাদের জীবন দাঁড় করাইতে গেলে ডায়-লেক্‌টিক পদ্ধতির সব কিছুই নড়চড় হইয়া যাইবে। কোথায় আমা-দের সেই দুই বিপরীত বস্তু (opposites)—যাহাদের মিলনে আমা-দের এই জীবন ? সেই দুইটি বস্তু হইতেছে জড় (matter) এবং চৈতন্য (spirit) ; কিন্তু মার্কস শুধু জড়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, চৈতন্যকে একদম উড়াইয়া দিয়াছেন। কেমন করিয়া তবে মার্কসের থিওরী ও কাজে সামঞ্জস্য রহিল ?

তা ছাড়া আরও কথা এই—অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর উৎকট জড়বাদের যুগেই মার্কস তাঁহার এই নব মতবাদ প্রচার করি-য়াছিলেন। সে যুগে নাস্তিকতার বন্যায় ইউরোপ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। জড়ের সাধনাই ছিল তখন বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য।

জড়বাদই ছিল সে যুগের ধ্রুব সত্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আনিয়াছে নূতন দৃষ্টি—নূতন বাণী। জড়বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে চলিয়াছে এখন এক নূতন পথে। Viscount Samuel বলিতেছেন :

"Science having emerged from the materialistic selfsufficient phase of the nineteenth century, now recognises the incompleteness of its own presentation. Since it recognises that there must be 'something else' it gives room for Deity."

অর্থাৎ :—"উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদমূলক স্বয়ংপূর্ণ পরিস্থিতি হইতে উত্থিত হইয়া বিজ্ঞান এখন ইহার অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতেছে। যেহেতু এখন সে বলে যে অন্য একটা-কিছু আছে, অতএব ইহা দ্বারা এই কথাই সে বলিতে চায় যে ঈশ্বর আছেন।"

জড়বাদ তাই আজকার দিনে একেবারেই অচল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই জড়বাদের উপরেই আছে মার্কসের সাধের কমিউনিজ্‌মের বুনিয়াদ। কাজেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, জড়বাদ যদি না টিকে, তবে কমিউনিজ্‌মও টিকিবে না। ভিত্তি ধ্বংস হইলে উপরের কাঠামোও ধ্বংস হইতে বাধ্য।

এই কারণেই বলা যাইতে পারে, যাঁহারা অন্ধ মার্কস্‌পন্থী, যাহারা মনে করেন কমিউনিজ্‌ম্ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ; তাহারা ভ্রান্ত।

কমিউনিজ্‌মের ভবিষ্যৎ

কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ কী ? যে-বেশে উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই বেশে উহা টিকিবে কি ? বিশ্ববাসী কি এই মতবাদকে গ্রহণ করিতে পারিবে ? এক কথায় : কমিউনিজমের এই অভিযান কি জয়যুক্ত হইবে ?

না। কমিউনিজ্‌ম্ আজ যে মূর্তিতে দেখা দিয়াছে, তাহা বেশী দিন টিকিবে না। নিম্নলিখিত কারণে কমিউনিজম রূপান্তরিত হইতে বাধ্য :

(১) জোর করিয়া ছোট-বড়, ধনী-নির্ধনকে সমভূমিতে টানিয়া আনিয়া এক করিবার রীতি বিশ্বপ্রকৃতিতে নাই। কার্লাইলের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় : সেই চিরদিনের 'না' (the everlasting "No') এবং চিরদিনের 'হ্যাঁ' (the everlasting 'Yes')-কে লইয়াই এই জগৎ। অতএব স্বভাবে যে সমতা নাই, মানব-সমাজে তাহা থাকিতে পারে না।

(২) কমিউনিজ্‌ম্ দাঁড়াইয়া আছে 'Dialectical Materialism'-এর উপর। এই কথাটি 'সোনার পাথর বাটির' মতই অদ্ভুত। যাহা dialectic তাহা materialism হইতে পারে না, আবার যাহা materialism তাহা dialectic হইতে পারে না। Dialectic হইতে হইলেই mateaialism-এর সঙ্গে spiritualism-কেও স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ জড়বাদের সহিত আধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বভাব বিদ্যমান। ডায়লেক্‌টিক হইতে হইলে তাই চাই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বস্তু। ডায়লেক্‌টিক ঠিক দ্বন্দ্ব সমাসের ন্যায় ; যেমন—'নরনারী'। শুধু 'নর' বা শুধু 'নারী' দ্বারা যেমন দ্বন্দ্ব সমাস হয় না, শুধু materialism লইয়া সেইরূপ ডায়লেক্‌টিক্ হয় না। বিরোধীয় বস্তুই যদি না থাকে, তবে 'conflicit and unity of opposites'-ই বা কি করিয়া হয় ? জড়বাদও থাকিবে, অধ্যাত্মবাদও থাকিবে—তবেই ত

বিরোধ আসিবে, আর তারপরেই ত আসিবে সমন্বয়ের কথা। পুঁজিবাদকে তাই একদম উড়াইয়া দিলে চলিবে না ; দুইটিকে রাখিয়া উহাদের মধ্যে একটা মিলন বা সাম্য ঘটাইতে হইবে। ইহাই হইল প্রকৃতির নিয়ম ; ইহাই হইল সত্যকার 'dialectic process.' কমিউনিজ্‌ম মুখে খুব জোর প্রচার করিতেছে যে dialectic process-এ এই জগতের সমস্ত কিছু চলিতেছে, কিন্তু কার্যত নিজেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এমন আত্মবিরোধী কোন মতবাদ দ্বিতীয় দেখা যায় না।

(৩) পুঁজিবাদকে যতটা নিন্দা করা হয় ততটা নিন্দনীয়ও নয়। পুঁজিবাদের দ্বারা দেশের যে শুধু অকল্যাণই হইতেছে তাহাও নয়, অনেক বড় বড় কাজ পুঁজিবাদীদের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। তাহা ছাড়া পুঁজিবাদ এখন আর পূর্বের ন্যায় উগ্র নাই। নানাবিধ শ্রমিক-আন্দোলনের ফলে উহার বহু দোষ কাটিয়া গিয়াছে। জাকাত না দিয়া দিলেই পুঁজিতে দোষ ঘটে, কিন্তু দিলে আর পুঁজিতে কোন দোষ নাই।

এ গেল সাধারণ দিক। ইসলামের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও—বর্তমান কমিউনিজ্‌ম্ চলিবে না। ইসলামী আদর্শকে পুরোপুরিভাবে স্বীকার না করিলে ইহা কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। কমিউনিজ্‌ম্ যখন আল্লাহকে মানিবে, ধর্মকে মানিবে, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধনের পার্থক্য স্বীকার করিয়া সকলকেই কোলে টানিয়া লইতে পারিবে, সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যকে মিলাইয়া সে যখন সকলের মধ্যে একটা সাম্য আনিতে পারিবে, তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। আর তখনই আসিবে প্রকৃত সাম্যবাদ। ছোট-বড়ই ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির এক সেটকে ধ্বংস করিয়া অন্য সেটকে বজায় রাখার নাম সাম্য নয় ; সকলকেই কায়েম রাখিয়া একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় আনিয়া দিতে পারিলে তাহাকেই বলে প্রকৃত সাম্য। বৈষম্যের ধ্বংসের নাম সাম্য নয়।

বলা বাহুল্য, একমাত্র ইসলামেই আছে এই সাম্য ; অন্য কোথাও নাই।

অতএব একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, কমিউনিজমের পরবর্তী সিঁড়িই হইতেছে ইসলামিজ্‌ম্। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, কমিউনিজম ইসলামের পথেই অগ্রসর হইতেছে। শুধু যে লেনিন বা স্ট্যালিনের হাতেই ইহা রূপ পাইতেছে তাহা নহে, ইসলামও অলক্ষ্যে ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ইহার গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যে ১৬টি রিপাবলিক লইয়া বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়া গঠিত তাহার মধ্যে পাঁচটিই হইতেছে মুসলিম রাষ্ট্র। নবজাগ্রত এই রুশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে বহু কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক ও সেনানায়কের আবির্ভাব হইয়াছে। সমরকন্দ ও বোখারাতে আজ নবপ্রভাতের গান শোনা যাইতেছে। শিল্প ও কৃষিও দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। কাজেই আশা করা যায়—ভবিষ্যতে এই সূত্র ধরিয়া ইসলাম এক নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে। রাশিয়া হইতেই ইসলামের নূতন বিশ্বঅভিযান আরম্ভ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এই মন্ত্রের প্রথমাংশ তাহারা গলাধঃকরণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে ; কালে কালে বাকীটুকুও সে গিলিবে এবং তখন তাহার চেহারা বদলাইয়া যাইবে।

"World comrades arise" এই স্লোগান থামিয়া গিয়া রাশিয়ার আকাশে-বাতাসে তখন ধ্বনিত হইবে ঃ

"World Muslims arise"

—বিশ্ব মুসলিম, জাগো !—

———

কমিউনিজ্মের সহিত ইসলামের রাজনৈতিক সম্বন্ধ

কমিউনিজ্মের বয়স এখন ত্রিশ বৎসরের অধিক। এই সময়ের মধ্যেই সে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়া এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করে। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার নানা জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সে এখন অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত।

অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির সহিতও সোভিয়েট রাশিয়ার গভীর যোগ রহিয়াছে। ইসলামকে না মানিলেও, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধ নাই। আল্লাহর এও এক কুদরৎ। ইসলামের দুশমনকে দিয়াই তিনি ইসলামের খিদমৎ করান। কমিউনিজ্‌ম্ আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের (ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী ও ইটালী)—প্রত্যেকেই ছিল ইসলাম তথা মুসলমানদের ঘোর শত্রু। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যেখানে যে মুসলিম রাজ্যগুলি আছে, সবগুলিকে তাহারা ছলেবলে কৌশলে ধ্বংস করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার মতলব করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ইংলন্ডই ছিল অগ্রণী। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই ইংলন্ড 'ইসলামের মিত্র' (Friend of Islam)-রূপে জগতে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে। শুনিলে আশ্চর্য লাগে, একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম ইউরোপের এই ইসলাম-ধ্বংসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তুরস্ক, পারস্য, আরব, মিসর, আফগানিস্তান ইত্যাদি রাজ্যগুলিকে বিপদের দিনে সাহায্য

করিয়াছে। এতদূর পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়ায় যদি সেই সময় কমিউনিজম উদ্ভব না হইত, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মধ্য-প্রাচ্যের কোন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্ব আজ দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। কাজেই, কমিউনিজমের সহিত মূলতঃ ইসলামের ঘোর বিরোধ থাকিলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলি কমিউনিজ্মের কল্যাণেই বাঁচিয়া গিয়াছে। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে দেখাইব, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, আরব প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট রাশিয়া দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছে।

(১) তুরস্ক

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুরস্কই ছিল খৃষ্টান-ইউরোপের সর্ব-প্রধান চক্ষুশূল। ইউরোপের মানচিত্র হইতে তুরস্ককে মুছিয়া ফেলিবার জন্য খৃষ্টানজগতে তাই চেষ্টার অবধি ছিল না। ক্রুসেডের অন্ধ আবেগ থামিয়া যাইবার পর তুর্কী সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবার নূতন নূতন কৌশল-জাল তাহারা উদ্ভাবন করিয়া চলিতেছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যকে অনবরত যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া ফেলাই ছিল তাহাদের প্রধান কৌশল। এই কৌশল কার্যতঃ জয়লাভও করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই কারণেই বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তুরস্কের অধীনে গ্রীস, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো, প্রভৃতি যে-সব ছোট ছোট খৃষ্টান রাজ্যগুলি ছিল, বড় বড় শক্তিগুলি তাহাদিগকে উস্কাইয়া দিয়া এবং তলে তলে সাহায্য করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ভাবে তুরস্ককে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখা হইল। এইসব যুদ্ধে বিদ্রোহীরা যখন জয়লাভ করিত বা স্বাধীন হইত, তখন ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কোনই কথাই বলিত না; তাহাদের স্বাধীনতাকে অম্লান বদনে তাহারা স্বীকার করিয়া লইত। কিন্তু যেই তুরস্ক কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিত, অমনি শক্তিপুঞ্জ ঘোষণা করিয়া উঠিত: statusquo রক্ষা করিতেই হইবে; অর্থাৎ কাহারো রাজ্য কেহ গ্রাস করিতে পারিবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে গ্রীস, সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো, সালোনিকা ইত্যাদি রাজ্যগুলি তুরস্কের হাতছাড়া হইয়া গেল। তুরস্ক এতই দুর্বল হইয়া পড়িল যে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তাহাকে 'ইউরোপের রুগ্নব্যক্তি' (the sickman of Europe) বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। নব্য তুর্কীদল (Young Turks Party) নামক একটি প্রগতিশীল বিপ্লবী দলের আবির্ভাব হইল। আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা প্রভৃতি প্রতিভাদীপ্ত তরুণের দল তুরস্ককে বাঁচাইবার জন্য নূতন পথে চলিলেন। তাঁহারা খেলাফৎ তুলিয়া দিলেন এবং তুরস্ককে নব্য ধরনে গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করিলেন। তখন আবদুল হামিদ (২য়) ছিলেন তুরস্কের সুলতান। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তরুণদল তুরস্কে দায়িত্বশীল শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নব্য তুর্কীদল তুরস্কের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিলেন না।

ঠিক এই সময়ে (১৯১৪) ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, মুসলিম রাজ্যগুলির ভাগবাঁটোয়ারা লইয়া মতবিরোধ ঘটাতেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীকে কিছু না দিয়া নিজেদের মধ্যে তুরস্ক, পারস্য, আরব ও আফগানিস্তানকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে চায়। ইহারই ফলে একপক্ষে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স অপর পক্ষে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী—এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ইংলন্ড ও রাশিয়ার মতলব বুঝিতে পারিয়া তুরস্ক তখন জার্মানীর স্বপক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করে।

যুদ্ধ শেষে কনস্টান্টিনোপল পড়িবে রাশিয়ার ভাগে এবং ইহার বিনিময়ে ইংলন্ড ও ফ্রান্সও অন্যত্র অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিবে, ইহাই ছিল দস্যুদিগের গোপন চুক্তি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর তারিখে তুরস্ক মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ঠিক ইহার পরদিনই ইংলন্ডরাজ পঞ্চম জর্জ তাঁহার রাজসভাস্থ রুশ-দূত Count Berkendorff-কে ডাকিয়া বলেন: "Constantinople must be yours" (অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল তোমাদের ভাগে)। এই চুক্তির বলেই কয়েকমাস পরে জার-সম্রাট নিকোলাস এক ভোজ-সভায় ফ্রান্সের রাজদূত

M. Poliologue-কে বলেন : "I have, Monsier Ambasador, made up my decision. The city of Constantinople with southern Thrace must be incorporated in my Empire," (অর্থাৎ শুনুন মসিঁও, আমি আমার মতলব স্থির করিয়াছি; কনস্টান্টিনোপল ও দক্ষিণ থ্রেস আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।)

চারি বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। জার্মানী, তুরস্ক প্রভৃতি হারিয়া গিয়া বিজেতাদের পদানত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত হীনতাজনক শর্তে জার্মানী সেভার্সে সন্ধি স্বাক্ষর করে।

সন্ধির পর মিত্রশক্তিপুঞ্জের যুদ্ধলব্ধ রাজ্য ও সুবিধাগুলি ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইবার কথা; কিন্তু ইত্যবসরে এমন একটি গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়া বসিল, যাহার ফলে ডাকুদিগের সব প্ল্যান মাটি হইয়া গেল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে বলশেভিজমের অভ্যুদয় হইল এবং বলশেভিক পার্টির অধিনায়ক লেনিন জার-সম্রাট নিকোলাস (২য়)-কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। জার ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, বলশেভিকরা ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদেরই ধ্বংসকারী। বিশ্বের সমুদয় রাজ্যকে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া শ্রমিক শাসন প্রবর্তন করাই ছিল বলশেভিজমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী রুশের যাবতীয় পরিকল্পনা নিকোলাসের সঙ্গে সঙ্গেই সমাধি প্রাপ্ত হইল। বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই (৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৭) লেনিন ঘোষণা করিয়া দিলেন : 'Constantinople must remain in the hands of the Muslims.' (অর্থাৎ : কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই মুসলিমদিগের হাতে থাকিবে।)

শুধু তাই নয়; সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তুরস্ক যাহাতে দাঁড়াইতে পারে সেজন্য লেনিন তুর্কীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইলেন। তুরস্ক যে জার-রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা এখন শাপে বর হইল। তাহাছাড়া ইতিপূর্বেই তাহারা সুলতান আবদুল হামিদ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেখাইয়াছে যে, তুর্কীরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং গণতন্ত্রের অনুরাগী। কাজেই লেনিন তুরস্ককে বন্ধুরূপেই গ্রহণ করিলেন। তুরস্কও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি এই কারণে ঝুঁকিয়া পড়িল। আনোয়ার পাশা নিজ প্লেনে করিয়া মস্কোতে গিয়া লেনিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আনোয়ার ছিলেন তুরস্কের আকাশে একটা উল্কাপিণ্ড। শুধু তুরস্কের ডিক্টেটর হওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, আরও অনেক বড় পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিতেছিল। তিনি দেখিতেছিলেন Pan-Islam-এর স্বপ্ন। সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম শক্তিপুঞ্জকে তিনি এক করিতে চাহিতেছিলেন। সেই স্বপ্নকে সফল করিতে গিয়াই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে বোখারার এক পার্বত্য অঞ্চলে রুশদিগের হস্তে নিহত হন।

সুলতান আবদুল হামিদ খানের সিংহাসনচ্যুতির পর আনোয়ার পাশা তুরস্কের কর্ণধার হইতে না পারার কারণও এই। কামাল পাশা ছিলেন বাস্তবদর্শী, আনোয়ার ছিলেন স্বাপ্নিক। এই কারণেই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল এবং ফলে কামাল পাশাই জয়ী হইয়াছিলেন। কামাল ও আনোয়ারের মতবিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্যও লেনিন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

এদিকে বৃটিশ আর এক নূতন চাল চালিল। কনস্টান্টিনোপল সংক্রান্ত প্ল্যানটা যখন লেনিন মাটি করিয়া দিলেন, তখন বৃটিশ-সিংহ গ্রীকদিগকে কনস্টান্টিনোপল দখল করিবার নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-কড়িও দিলেন। হতবল কামাল পাশা যে

গ্রীকদের হাতে পরাজিত হইবেই, এই ভরসাতে ইংলন্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ এক ভোজসভায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন : "This is the last Crusade against Islam" অর্থাৎ : ইসলামের বিরুদ্ধে ইহাই শেষ ক্রুসেড। কিন্তু এখানেও তাদের দুরাশা সফল হইল না ; শত্রুর মুখে ছাই পড়িল। বীর-কেশরী কামাল পাশা গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। ইংলন্ড ঠান্ডা হইল। এইরূপে ইউরোপের "রুগ্ন ব্যক্তি" বাঁচিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য ইহারও মূলে ছিল বলশেভিকদের সাহায্য ও সহানুভূতি। রুশ-ভল্লুক নিকোলাস যদি এই সময় সিংহাসনচ্যুত না হইতেন এবং বৃটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা যদি তুর্কীদিগকে সাহায্য না করিত, তবে আজ হয়ত তুরস্কের অস্তিত্বই থাকিত না।

(২) ইরান

বলশেভিকদের কল্যাণে পারস্য বাঁচিয়া গিয়াছে। রুশ-ভল্লুক ও বৃটিশ-সিংহের মধ্যে গোপন চুক্তি হইয়াছিলো ইরানকে উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবার ; ইংরাজ লইবে দক্ষিণ ইরান, জার লইবে উত্তর ইরান। বলাবাহুল্য, ইরান তেলের খনির জন্য বিখ্যাত। এই তেলই ছিল ইংলন্ড ও রাশিয়ার প্রধান আকর্ষণ। তা ছাড়া রাজনৈতিক গুরুত্বও এর যথেষ্ট ছিল। রুশ-সম্রাট জোর-জবরদস্তি করিয়াই উত্তর ইরানে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিল ; কিন্তু কৌশলী ইংরাজ অন্যভাবে ইরানকে গ্রাস করিবার মতলব করিয়াছিল। "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" খুলিয়া তাহারা যেমন ধীরে ধীরে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, পারস্যকে গ্রাস করিবার জন্যও অবিকল সেইরূপ এক ফন্দি আঁটিল। পারস্য সম্রাটের অনুমতি লইয়া তাহারা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'Anglo persian Oil Company' নামক একটি

যৌথ কারবার খুলিল। বিখ্যাত 'বর্মা অয়েল কোম্পানীর' Lord Strathcona হইলেন এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং William krox D. Arcy হইলেন ইহার ডিরেক্টর-সেক্রেটারী।

এই কোম্পানীর মধ্যবর্তীতায় বৃটিশ ধীরে ধীরে ইরানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ ৭৫,০০০ পাউণ্ডের শেয়ার একা খরিদ করিয়া লইল; ইহাতে ইরান-গভর্ণমেন্টের স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। বাৎসরিক লভ্যাংশের শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ ইরানের ভাগ্যে পড়িল। এইরূপে একদিক দিয়া ইংরেজ এবং অপরদিক দিয়া রাশিয়া ইরানকে দিনে দিনে গ্রাস করিতে লাগিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের আর একটি গোপন চুক্তি এই হইল যে, পারস্যের যে-অংশটুকু তখনও স্বাধীন ছিল, সেটুকুও ইংরেজকে অধিকার করিতে দিতে হইবে ; ইহার বিনিময়ে জার-সম্রাটকে যুদ্ধশেষে কনষ্টান্টিনোপল দেওয়া হইবে। সম্রাট নিকোলাস ইহাতে রাজী হন, তবে একটি শর্ত এই জুড়িয়া দেন যে, ইয়াজদ এবং ইস্পাহান নামক দুইটি স্থানও রাশিয়াকে দিতে হইবে। এই চুক্তির কথা তখন গোপন রাখা হয়।

কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া রাশিয়ার শাসনভার যেই বলশেভিকদিগের হস্তে আসিল, অমনি ডাকুদিগের সমস্ত প্ল্যানটাই মাটি হইয়া গেল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ট্রটস্কি (Trotsky) সরকারী চিঠি দ্বারা (Note) ইংরেজকে জানাইয়া দিলেন যে ইতিপূর্বে জার-সম্রাট ইরানকে যে-সব চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছেন, এখন আর ইরানকে তাহা মানিতে হইবে না। জার-সম্রাট ইরানে যে সুবিধা (Concessions) ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাও বলশেভিক গভর্ণমেন্ট পরিত্যাগ করিলেন। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে ইরানকে সাহায্য করিবেন, এরূপ আশ্বাসও দিলেন।

বলশেভিকদিগের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ-রাজ পারস্যকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইল। সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, রেলষ্টেশন, বন্দর প্রভৃতি দখল করিয়া বসিল। তাহা ছাড়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ ইরানের কতকটা অংশ রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়াত দূরের কথা, রাশিয়ার প্রভাবান্বিত উত্তর ইরানও তাহারা দখল করিয়া লইল। এমন কি ককেশাস ও আজারবাইজান প্রদেশদ্বয় দখল করিয়া আফগানিস্তানের দিকেও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমুদ্রপথেও বৃটিশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল। কাস্পিয়ান সাগরের সমুদয় ইরানীয় উপকূলভাগ বৃটিশের আয়ত্তাধীনে আসিল। পারস্যকে ঘাঁটি (base) করিয়া বলশেভিক রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে, ইহাই হইল তাহার মতলব।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েট রাশিয়া ইরানকে একটি সরকারী পত্র দ্বারা জানাইলেন ঃ (১) জার-গভর্ণমেন্টের নিকট পারস্যের যে ঋণ ছিল, তাহা নাকচ করা হইল, (২) জার-রাশিয়া পারস্যের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে যে-সব বাণিজ্য শুল্ক আদায় করিত, তাহা রহিত করা হইল ; (৩) জার-রাশিয়া ইরান-গভর্ণমেন্টকে চাপ দিয়া যে সব চুক্তি বা সুবিধা (concessions) আদায় করিয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইল ; (৪) রাশিয়া এতদিন ইরানে যে ব্যাঙ্ক চালাইয়া আসিতেছিল, তাহার সমস্ত টাকাকড়ি সাজ-সরজাম ইরানকে দাই করা হইল ; (৫) যে সমস্ত রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসাদি রাশিয়া কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, সে সমস্তই ইরানকে দান করা হইল। এইরূপে জার-সম্রাট নিকোলাসের সমস্ত অপকর্ম বলশেভিকেরা মিটাইয়া দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইরান গভর্ণমেন্ট এইসব সুবিধা ভোগ করিতে পারিল না। এই ঘোষণার তিন মাস পরেই সুচতুর বৃটিশ ইরানের শাহের নিকট হইতে সামরিক ও আর্থিক যাবতীয় শাসনভার কাড়িয়া লইল। কাজেই সোভিয়েট প্রদত্ত

এত সুযোগ ও সুবিধার একটাও ইরানের কাজে লাগিল না। ইহার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ সমগ্র ইরান অধিকার করিয়া ইহাকে আশ্রিত রাজ্য (protectorate) বলিয়া ঘোষণা করিল।

ইসলামের তখন চরম দুর্দিন। তুরস্ক ও পারস্য দুইটি শক্তিশালী মুসলিম-রাজ্যই তখন বৃটিশের পদানত। ইহার ফলে আফগানিস্তানের অবস্থাও খুব কাহিল হইয়া পড়িল। মধ্য-প্রাচ্যের ইসলামী শক্তির সবগুলিই এইরূপে একেবারে শত্রুদের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

এই দারুণ দুর্দিনে কাহাদের হাত দিয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য নামিল? শুনিলে আশ্চর্য লাগে, আল্লাহ্‌কে যাহারা মানে না, তাহারাই আসিল আল্লাহ্‌র ইসলামকে রক্ষা করিতে। সোভিয়েট সেনাদল (Red Army) বৃটিশের মতলব ব্যর্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইল এবং ডেনিকিনের সেনাদলকে পরাস্ত করিয়া ককেশাস পর্যন্ত ধাওয়া করিল। তারপর ২৯শে এপ্রিল, ১৯২০, বাকু (Baku) দখল করিয়া বসিল। অবশেষে ডেনিকিনের নৌশক্তি ধ্বংস করিয়া বৃটিশকে উত্তর ইরান হইতে তাড়াইয়া দিল।

এই অপ্রত্যাশিত পট-পরিবর্তনের ফলে পারস্যের ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটিল। পারস্যের শাহ দৃপ্ততেজে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন রেজা শাহ পাহলবী নূতন ক্যাবিনেট গঠন করিয়া প্রধান-মন্ত্রী হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-সম্পাদিত Anglo-persian Agreement অস্বীকার করিয়া Soviet-persian Treaty সম্পাদন করিলেন। এই সন্ধির শর্তাবলী অবিকল ট্রটস্কি-প্রদত্ত সুবিধাগুলিরই পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

ইরানের গোলামীর জিঞ্জির এইরূপে কাটিয়া গেল। রেজা শাহ্‌ পারস্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ইহার রাজা হইলেন।

আজাদী লাভের সঙ্গে সঙ্গেই রেজা শাহ্‌ বৃটিশের যাবতীয় হীনতা-জনক শর্তাবলী উল্টাইয়া দিলেন। মিলিটারী সার্ভিস হইতে বৃটিশ

অফিসারদিগকে তাড়াইলেন, দক্ষিণ ইরানের বৃটিশ পোষিত 'খান' এবং 'শেখ' দিগকে স্ববশে আনিলেন এবং 'South persian Rifle নামক বৃটিশ-অনুরাগী সেনাদলকেও ডিসমিস করিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে Anglo-Persian Oil Company-ও তুলিয়া দিলেন। বৃটিশ-সিংহ তখন লেজ গুটাইয়া সরিয়া পড়িল।

এইরূপে বলশেভিকদিগের কল্যাণে ইরান ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

(৩) আফগানিস্তান

আফগানিস্তান আজ যে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহারও মূলে আছে বলশেভিকদিগের সাহায্য ও প্রভাব।

অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলির ন্যায় আফগানিস্তানকেও গ্রাস করিবার মতলব ছিল রাশিয়া ও ইংলণ্ডের। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়াই তাই ইংরাজ ও রাশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তানকে লইয়া একটা টাগ-অব্-ওয়ার চলিতেছিল।

ইংরাজ যে সময় ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিতেছিল, রাশিয়াও ঠিক সেই সময়ে মধ্য এশিয়ায় আপন ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিল। এইভাবে রাশিয়া যখন আফগান সীমান্তের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, তখন বৃটিশের ভয় হইল হয়ত বা আফগানিস্তানের সঙ্গে মিতালি করিয়া রুশ সম্রাট ভারত আক্রমণ করিয়া বসে! কাজেই ছলে বলে কৌশলে আফগানিস্তানকে স্ববশে রাখাই হইল বৃটিশ পলিসি।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ। লর্ড অকল্যাণ্ড তখন ভারতের বড়লাট। এই সময় রুশ-আক্রমণের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তখন কাবুলের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ। দোস্ত মোহাম্মদ ইংরাজদিগের নিকট হইতে কোনরূপ সুবিধা আদায় করিতে না পারিয়া রাশিয়ার

সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড ইহাতে আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আফগানিস্তানকে আক্রমণ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলেন না। দোস্ত মোহাম্মদকে তাড়াইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুজা খাঁকে সিংহাসনে বসাইবেন, ইহাই হইল তাঁহার মতলব। ১৬,০০০ ইংরাজ সৈন্যের এক বিরাট অভিযান কাবুলের দিকে অগ্রসর হইল। ইহাই প্রথম আফগান যুদ্ধ। কিন্তু ইংরাজদের ঐ অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। ইংরাজ কাবুলে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। মাত্র একটি লোক (ব্রাইটন) ছাড়া আর সমস্ত সৈন্যই দুর্ধর্ষ আফগানদিগের হস্তে নিহত হইল।

বহু রাজনৈতিক ঘটনার পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের সহিত বৃটিশের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন কাবুলের আমীর শের আলী। আবদুর রহমান খাঁকে বিতাড়িত করিয়া তিনি কাবুল সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আবদুর রহমান তখন রাশিয়ায় পলাতক। সেখান হইতে সৈন্যদল লইয়া তিনি কাবুল আক্রমণ করিতে পারেন, এ-ভয়ও শের আলীর ছিল। এই কারণে তিনি রাশিয়ার সহিত মিতালি করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে ইংরাজেরা বিচলিত হইয়া উঠিল। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লিটন তখন আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহাই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে শের আলীর পরাজয় ঘটিল। তিনি রুশ তুর্কিস্থানে পালাইয়া গেলেন। তখন বৃটিশ সরকার শের আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব খাঁকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। নূতন আমীরের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হইল। সন্ধিতে স্থির হইল যে বৃটিশ সরকারের সম্মতি না লইয়া আফগানিস্তান অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তি করিতে পারিবে না এবং কাবুলে বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে হইবে। ইহার বিনিময়ে ইংরেজ সরকার আমিরকে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিবে।

সন্ধি অনুসারে ইংরেজ সরকার কাবুলে বৃটিশ-দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু চির-আজাদ আফগান জাতি এই হীনতার গ্লানি বহন করিতে রাজী হইল না। শের আলীর বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং পলাতক আবদুর রহমান খাঁকে আহ্‌বান করিল। আবদুর রহমান তখন কয়েকজন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া বীরদর্পে কাবুলে প্রবেশ করিলেন এবং শের আলীকে তাড়াইয়া দিয়া কাবুলের স্বাধীন আমীর হইয়া বসিলেন।

ইংরেজরা আবদুর রহমানের এই জনপ্রিয়তা দেখিয়া ভয় পাইল। তাহারা শের আলীকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া দোস্ত মোহাম্মদকেই আমীর বলিয়া মানিয়া লইল। আফগানিস্তানে বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখিবার প্রস্তাব ইংরাজ তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহা হইলেও বৃটিশের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আবদুর রহমানের সহিত এই সন্ধি হইল যে, তিনি বৃটিশ ভিন্ন অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধি করিতে পারিবেন না। অবশ্য ইহার বিনিময়ে বৃটিশ সরকার আমীরকে বাৎসরিক ১৮ লক্ষ টাকা নজর সেলামী দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে আফগানিস্তান ইংরেজের কবলে আসিয়া পড়িল।

আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হাবীবুল্লাহ খান সিংহাসনে বসেন। তিনি দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। পিতার ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল না।

এই সময়ে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন লাগে। আবদুর রহমান খাঁ এই সময়ে বাঁচিয়া থাকিলে এই মহাযুদ্ধের সুযোগ লইয়া তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু করিয়া বসিতেন। কিন্তু আমীর হাবিবুল্লাহ হেলায় এ-সুযোগ নষ্ট করিলেন। আফগানেরাও তাহাকে পছন্দ করিল না। গুপ্তঘাতকের হস্তে তাই তিনি নিহত হইলেন।

ইহার পরই তদীয় পুত্র আমানুল্লাহ খান কাবুলের আমির হন। আমানুল্লাহ ছিলেন বৃটিশ-বিরোধী। তিনি দেখিয়াছিলেন বৃটিশ-রাজ

ধীরে ধীরে স্বাধীন আফগান জাতিকে গোলামীর শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। এতদিন বৃটিশ রাজ আফগানিস্তানকে বাৎসরিক ১৮ লক্ষ টাকার নজর সেলামী দিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আমানুল্লাহ দেখিলেন, ইহা গোলামীরই চিহ্ন। এই গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ আজাদী লাভ করাই ছিল আমানুল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং থলের যুদ্ধে ইংরেজদিগকে পরাজিত করেন। মহাযুদ্ধের এই দারুণ ক্লান্তিতে বৃটিশ তখন অবসন্ন। আয়ারল্যাণ্ড, মিসর, ভারতবর্ষ সর্বত্রই তখন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। তদুপরি রাশিয়ার বলশেভিকরাও তখন বৃটিশের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিপদ বুঝিতে পারিয়া বৃটিশ তাই তাড়াতাড়ি আমানুল্লাহর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বৃটিশ-সিংহ আমানুল্লাহ্‌কে আফগানিস্তানের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই হইতে "আমীর আমানুল্লাহ" "His Majesty king Amanullah" নামে খ্যাত হইলেন। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডের আর কোন হাত রহিল না।

বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে আমানুল্লাহ বলশেভিকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। লেনিনের সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইয়াছিল এবং তিনি আমানুল্লাহকে ৫,০০,০০০ ডলার বার্ষিক সাহায্যও মঞ্জুর করিয়াছিলেন।* কিন্তু এ আনন্দ বেশীদিন টিকিল না। শীঘ্রই আবার নতুন বিপদ দেখা দিল।

---

*The 5,00,000 dollars promised by the Bolsheviks he (Amanullah) did not get regularly. Sometimes he got some of it in cash (gold), sometimes in kind (kidwai. Pan-Islam and Bolshevism : page 116).

আমানুল্লাহ ছিলেন অতিমাত্রায় প্রগতিশীল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল, স্বপ্ন ছিল, যোগ্যতাও ছিল; কিন্তু ছিল না দূরদর্শিতা। রাতারাতি তিনি আফগানিস্তানকে ইউরোপের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আফগান জাতি চিরদিনই রক্ষণশীল। শরিয়তের আদর্শকে তাহারা খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করিয়া চলে। আমানুল্লাহ আফগান চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিয়াই সংস্কারকার্যে হাত দিলেন। তাঁহার স্ত্রী বেগম সুরাঈয়া ছিলেন ইউরোপীয় ফ্যাশনের পূর্ণ অনুরাগিণী, রাজা-রাণী তাই চলিলেন ইউরোপ ভ্রমণে। উদ্দেশ্য ঃ ইউরোপ হইতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কুড়াইয়া আনিয়া স্বদেশকে তদনুরূপ গড়িয়া তুলিবেন। সুচতুর ইংরাজ এই মহাসুযোগকে ছাড়িবে কেন? তাহারা বুঝিয়াছিল আমানুল্লাহ অতিমাত্রায় বৃটিশ-বিরোধী, সোভিয়েট রাশিয়ার দিকেই তাহার মনের টান। কাজেই আমানুল্লাহকে কাবুল সিংহাসন হইতে সরাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মঙ্গল। ইহাই ভাবিয়া তাহারা আমানুল্লাহর এই ইউরোপ-প্রীতিকে নিজেদের কাজে লাগাইবার মতলব করিল। আমানুল্লাহ ও বেগম সুরাঈয়া যখন ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতেছিলেন তখন ইংরেজরা অতি কৌশলে বেগম সুরাঈয়ার মেমসাহেবী পোশাক-পরিচ্ছদ ও শয়নকক্ষের বিভিন্ন গোপন অবস্থার ফটো লইয়া অথবা কৃত্রিম ফটো তৈরী করিয়া আফগানদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দেখাইয়া দিল যে, আমানুল্লাহ ও বেগম সুরাঈয়া শরিয়তের ঘোর বিরোধী। এই প্রোপাগাণ্ডার ফলে রক্ষণশীল আফগানেরা আমানুল্লাহর উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। রাজা-রাণীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বাচ্চা-ই সাক্কা নামক একব্যক্তি কাবুল সিংহাসন দখল করিলেন। অবশ্য এই সিংহাসন ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার বেশী দিন ঘটে নাই। ইহার কিছুদিন পরেই আফগান সেনাপতি নাদির শাহ্ বাচ্চা-ই-সাক্কাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কাবুলের রাজা হন। কিন্তু তিনিও গুপ্তঘাতকের

হস্তে প্রাণ হারান। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জহির শাহ এখন আফগানিস্তানের বাদশাহ।

এইরূপে আমানুল্লাহর সময় পর্যন্ত কুচক্রী বৃটিশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে ছাড়ে নাই। অবশ্য এত করিয়াও তাহারা বিশেষ কোনই সুবিধা করিতে পারে নাই। আফগানিস্তানের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধই বজায় রহিয়াছে।

তাহা হইলে আফগানিস্তানের ব্যাপারেও দেখা গেল, বলশেভিকদিগের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলেই আফগানিস্তান বৃটিশের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

(৪) আরব

ইসলামের কেন্দ্র-স্থল পবিত্র আরব-ভূমিও বলশেভিকদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য লাগে, আল্লাহকে যাহারা মানে না, তাহাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তাঁহার আপন ঘরকে রক্ষা করাইলেন! বলা যাইতে পারে ঃ তুরস্ক, ইরান বা আফগানিস্তানকে বলশেভিকেরা সাহায্য করিয়াছিল রাজনৈতিক আদর্শের খাতিরে। কিন্তু আরবকে কেন সাহায্য করিতে গেল?

তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের ন্যায় আরব-ভূমিও ছিল ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের মস্তবড় আকর্ষণের বস্তু। পূর্বেই বলিয়াছি ঃ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ধ্বংসের মধ্য দিয়া ইসলামকে ধ্বংস করাই ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রধান লক্ষ্য। আরবকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী হস্তগত করিতে পারিলে সমগ্র মুসলিম জাহানের নৈতিক মনোবল ও আত্মিক সংযোগ চিরদিনের তরে

নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ইসলাম আর কখনো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না—ইহাই ছিল আরব-ধ্বংসের মূল প্রেরণা।

জজিরাতুল আরব ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন। প্রথম মহাযুদ্ধ তুরস্ক যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মানীর সহিত যোগ দেয়; তখন বৃটিশের কুমতলব বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। গোপনে গোপনে বৃটিশ মক্কার শরীফ হুসেনকে ঘুষ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলে। শুধু হুসেনকে নয়, আরবদিগকেও অনেক টাকা ঘুষ দেয়। হুসেনকে বৃটিশ বলে: "কেন তোমরা আর তুরস্কের অধীন থাকিবে? বিদ্রোহী হও। যুদ্ধশেষে আরব; ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি দিয়া একটি আরব-সাম্রাজ্য গঠন করিয়া দিব এবং তোমাকে তাহার বাদশাহ্ করিব।" বৃটিশের এই টোপ হুসেন অনায়াসেই গিলিয়া বসিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে জাতীয় স্বার্থকে জবাই করিলেন।

কিন্তু বৃটিশের কূটনীতি বুঝা হুসেনের সাধ্যে কুলাইল না। হুসেনে সঙ্গে চুক্তি করিবার পরই বৃটিশ ফ্রান্সের সহিত আর একটি গোপন চুক্তি করিল যে, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ফ্রান্স পাইবে এবং মক্কা-মদিনা ও অন্যান্য অংশ বৃটিশ পাইবে আর ইহারই বিনিময়ে রাশিয়াকে দেওয়া হইবে কনষ্টান্টিনোপল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বৃটিশের স্বপক্ষে যোগ দিলেন এবং হেজাজের রাজা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপুত্র আমির ফৈসুল আরব বাহিনীকে তুরস্কের বিরুদ্ধে চালনা করিল। জেনারেল এলেনবী ফৈসুলের সাহায্যে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন দখল করিলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ এক ভোজ-সভায় এই বলিয়া আস্ফালন করিলেন: "The name of General Allenby will be ever remembered as that of the brilliant Commander who fought and won the last

and most triumphant of Crusades." (অর্থাৎ: সেনাপতি এলেনবীর নাম শেষ ক্রুসেডের গৌরবোজ্জ্বল বীররূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে)। আফসোস! সেই ভোজ-সভায় শরীফ হুসেনও উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর হুসেনের ভুল ভাঙ্গিল। কোথায় বৃটিশের সেই গোপন চুক্তি? কোথায় সেই আরব-সাম্রাজ্য? সমগ্র জজিরাতুল আরব বিজিত হইল, অথচ বৃটিশ এখনও কোন কথা বলে না কেন? হুসেন প্রশ্ন করা আরম্ভ করিল। শুধু তাই নয়, বৃটিশ-ফ্রান্স-জারের মধ্যে যে গোপন চুক্তি হইয়াছিল, বলশেভিকরা তাহা ফাঁস করিয়া দিল। তখন হুসেন বুঝিতে পারিল বৃটিশ কী খেলা খেলিয়াছে। সে তখন স্বভাবতঃই বলশেভিকদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং চিচেরিনের সহিত গোপন পত্রালাপ আরম্ভ করিল। বৃটিশ ইহা বরদাশ্ত্ করিবে কেন? তাহারা একটা চাল হাতে রাখিয়াই দিয়াছিল; হুসেনের বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহারা তখন ইবনে সৌদকে হুসেনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া দিল। ইবনে সৌদ অনায়াসে হুসেনকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। বৃটিশ তখন সিংহাসন চ্যুত হুসেনকে সাইপ্রাস দ্বীপে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। হুসেনের পুত্র ফৈসুল ও আলির ভাগ্যও পিতার অনুরূপই হইল। মোনাফেকীর চূড়ান্ত শাস্তি তাঁহারা পাইলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইবনে সৌদ হেজাজ ও নেজ্দের সুলতান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। সেই হইতে ইবনে সৌদই হেজাজের রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। বলশেভিকরা শরীফ হুসেনকে সাহায্য করিলেও ইবনে সৌদের বেলায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করিল। তাহারা ভাবিল, বৃটিশের হাতে না গিয়া যে-কোন আরব বাসীর হাতে হেজাজের শাসনভার থাকিলেই হইল। তাই তাঁহারা ইবনে সৌদকেই হেজাজ ও নেজ্দের সুলতান

বলিয়া মানিয়া লইল। সেই হইতে কমিউনিস্টদের সহিত ইবনে সৌদের সদ্ভাবই রহিয়া গিয়াছে।

ইবনে সৌদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে এবং বলশেভিকদের সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাবের প্রভাবে বৃটিশ আরব দেশে আর কোন সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। তবে প্যালেস্টাইন হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান ও আরব এই রূপেই বলশেভিকদের অছিলায় বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পূর্বেই বলশেভিজমের অভ্যুদয় না হইলে মুসলিম স্টেটগুলির দশা এখন কী দাঁড়াইত, অনুমান করা কঠিন।

মার্ক্সীজ্‌ম্‌ কি বাঁচিয়া আছে ?

কোন একজন সুরসিক লেখক বলিয়াছেন : "All ismns have become wasms." (অর্থাৎ : সমস্ত ইজ্‌ম্‌ এখন ওয়াজমে পরিণত হইয়াছে)। মার্ক্সীজম্‌ সম্বন্ধেও কি তাই ?

কমিউনিজমের বুনিয়াদ হইল মার্ক্সীজ্‌ম্‌। কমিউনিজমের যুক্তি, দর্শন ও অঙ্গীকার সমস্তই মার্কসের। কমিউনিজ্‌ম্‌ কেন আসিবে, কেমন করিয়া পুঁজিবাদের পতন হইবে, কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রবর্তিত হইলে মানুষের কি কি সুখ-সুবিধা ঘটিবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মার্কস্‌ বহু যুক্তি-প্রমাণ ও ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। সেইসব যুক্তি প্রমাণ ও অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়াই রাশিয়ার বলশেভিকরা নিজ দেশে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করে। আজ ৩০ বৎসরেরও ঊর্ধকাল হইতে রাশিয়ার কমিউনিজম চলিতেছে। মার্কসের সমস্ত থিওরী সেখানে পরীক্ষিত হইয়াছে। কাজেই আমরা এখন দেখিতে চাই : মার্কসের মতবাদ ধোপে টিকিয়া গিয়াছে কি না ; অন্য কথায় মার্কসবাদ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না।

(১) মার্কস চাহিয়াছিলেন ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ। ধর্মকে নির্বাসন দেওয়াই ছিল তাই কমিউনিজমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মার্কসের এই আশা সফল হয় নাই। ধর্মভাব মানুষের মনের সহজাত একটি বৃত্তি। সেই স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধতা করিয়া মানুষ বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না ; একটা প্রতিক্রিয়া আপনা আপনিই দেখা দেয়। সোভিয়েট রাশিয়াতেও তাহাই ঘটিয়াছে। নির্বাসিত ধর্ম দিনে দিনে আবার ফিরিয়া আসিতেছে ; গীর্জাতে আবার লোকেরা যাওয়া-আসা আরম্ভ করিয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলিরত কথাই নাই। সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সহস্র সহস্র মুসলমান এখনো প্রতিবৎসর মক্কা-শরীফে

হস্ত করিতে যায়। সোভিয়েট রাশিয়া এই জন্যই ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিয়াছে; এখন সে অনেকটা ধর্মের স্বাধীনতা দিয়াছে। ধর্ম এখন সেখানে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অপরদিক দিয়াও মার্কসের এই অধর্মের অভিযান সফল হয় নাই। এক ধর্মকে তাড়াইতে গিয়া আর এক ধর্মের ভূত আসিয়া কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়াছে! কমিউনিস্টদের নিকট এখন মার্কসই হইতেছেন ঈশ্বর এবং মার্কস্‌বাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ই হইয়াছে তাহাদের ধর্ম। মার্কসের 'ক্যাপিটাল'কে (Das Kapital) কমিউনিস্টরা একটা প্রেরণাপূর্ণ, অবতীর্ণ ও অব্যর্থ গ্রন্থ ("revealed, inspired and infallible") বলিয়া মনে করে এবং এজন্যই 'ক্যাপিটাল'কে 'শ্রমিকদিগের বাইবেল' বলা হয়। খৃস্ট-ধর্মের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের সহিতও এই নূতন ধর্মের অবিকল মিল আছে। খৃস্টধর্মে অবিশ্বাসীদিগকে যেমন পুড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা (Inquisition) ছিল, কমিউনিজমে অবিশ্বাসীদিগকেও তেমনি ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। Iljin নামক জনৈক লেখকের "The World on the Brink of the Abyss" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়ঃ কমিউনিজ্‌ম্‌কে স্বীকার না করার অপরাধে অথবা কমিউনিজম-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকিবার কোনরূপ সত্য বা অমূলক সন্দেহে বলশেভিকরা মোট, ১৮,৬০,০০০ লোককে হত্যা করিয়াছে; তন্মধ্যে ২৮ জন বিশপ, ১২০০ পাদ্রী, ৬০০০ শিক্ষক, ৮৮০০ ডাক্তার, ১৯২০০০ শ্রমিক এবং ৮১৫,০০০ কৃষক (Economics of Islam-p. 80)। খৃস্টান পাদ্রীরা যেমন বলেঃ খৃস্টধর্ম গ্রহণ কর, তবে তোমরা 'ত্রাণ' পাইবে, কমিউনিজমের প্রচারকেরাও ঠিক তেমনি বলে, কমিউনিজম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরা মুক্তি পাইবে। খৃস্টানদের যেমন Rome, কমিউনিস্টদের তেমনই Kremlin। এইরূপে খৃস্টধর্মের যাবতীয় ভূতই এখন কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়া ধর্মকে তাড়াইবার

অপচেস্টার প্রতিশোধ লইতেছে। স্বভাবের নিকট মার্কস্‌বাদ এইরূপে পরাজিত হইয়াছে। "you may expel Nature with a pitchfork, she will come back."—(অর্থাৎঃ স্বভাবকে তাড়াইয়া দিলেও সে আবার ফিরিয়া আসে)। এই বাক্য সত্যই সত্য!

(২) পূর্বে ধনসম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত অধিকার (private ownership) একদম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এই আইনও এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন কি এখন পুত্র-কন্যাদিগকে কিছুটা ধনসম্পত্তি উইল করিয়াও দেওয়া যায়। ইহা দ্বারা পূর্বের সেই পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবস্থা ও নীতিকে খানিকটা মানিয়া লওয়া হইয়াছে বৈ কি?

(৩) পূর্বে ছেলে-মেয়েকে একসঙ্গে শিক্ষা (co-education) দেওয়া হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থার কুফল বুঝিতে পরিয়া ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে স্ট্যালিন আইন করিয়া এই সহ-শিক্ষা তুলিয়া দিয়াছেন। ছেলে ও মেয়ের শিক্ষা যে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট তাহা মানিয়া লইয়াছেন।

(৪) পুঁজিবাদকে তুলিয়া দিয়া দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ স্থাপন করাই ছিল কমিউনিজমের প্রধান অঙ্গীকার। উহার মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ দেশের সমস্ত শিল্পকে জাতীয়করণ (nationalized) করিয়া দেশবাসীর অর্থ-বৈষম্যকে দূর করা এবং সর্বপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ তুলিয়া দিয়া সকলকেই সম-অধিকার দান করা। স্টেট (State) অথবা ডিক্টেটরশিপ (Dictatorship) প্রতিষ্ঠাও কমিউনিজমের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। সর্বসাধারণই হইবে দেশের মালিক, ডিক্টেটরও নয়, স্টেটও নয়—ইহাই ছিল তাঁহার আদিম পরিকল্পনা। তবে যেহেতু এই চরম সাম্য রাতারাতি আনা যায় না, তাই সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই ডিক্টেটর ও স্টেটের প্রয়োজন হইয়াছিল। কথা ছিলঃ লোকেরা যখন সাম্যবাদের আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করিতে পারিবে, তখন এই ডিক্টেরশিপ এবং

ষ্টেট—দুইই উড়িয়া যাইবে ('The State will wither away"—Lenin)। আবার একথাও ছিল যে, ডিক্টেটর যিনি হইবেন, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপেই দেশ শাসন করিবেন—স্বাধীনভাবে বা স্বেচ্ছাচারীরূপে নয়। পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সাম্যনীতিও পরিবর্তিত হইবে। এখন যেমন যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকের মজুরী বা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়; তখন আর সেইরূপ হইবে না। তখন যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে, সে তাহাই পাইবে। "From each according to his capacity to each according to his needs" ইহাই হইবে চরম সাম্যের মূলমন্ত্র।

কিন্তু এই ৩০ বৎসরের সাধনার পর আমরা সোভিয়েট রাশিয়ায় কী দেখিতেছি? ষ্টেট বা ডিক্টেটরশিপ কি ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইবার অবস্থায় আসিয়াছে? প্রয়োজন অনুযায়ী সবই পাইব—এমন অবস্থা কি সম্ভব হইয়াছে? কখনই না। বরং উল্টা ফলই ফলিয়াছে। ষ্টেট উঠিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, ষ্টেটই এখন সর্বেসর্বা। ডিক্টেটরের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ত দূরের কথা, ডিক্টেটরই এখন সর্বময় কর্তা। লেনিনের মৃত্যুর পর (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে) ষ্ট্যালিন সেই যে রাশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা হইয়াছেন, আর সেখান হইতে তাহার সরিবার কোন মতলব নাই। (১)

সাম্যবাদের মূলনীতি ছিল: "power must not be concentrated in the hands of an individual." (অর্থাৎ এক হাতে কিছুতেই যেন শক্তি কেন্দ্রীভূত না হয়।) কিন্তু ষ্ট্যালিন সে নীতির কোন ধার ধারেন না। ডিক্টেটরের পদ হইতে তাঁহাকে হটায়,

(১) The first secretary of the Communist party, Stalin, is irremovable, his power is absolute and unlimited.—(Stalin's Russia, by S. Labin, p. 47)

এমন শক্তিমান পুরুষ আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় নাই। ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কাহারো টু শব্দটি করিবার সাহস নাই। ষ্ট্যালিনকে এখন একমাত্র মিসরের ফেরাউনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জনৈক খ্যাতনামা লেখক তাই বলিতেছেন:

"Titles and names are frequently changed in the Soviet Union. why not Stalin's own? It is not longer suitable. Why not Nectanebo III, pharaoh of all the Russias!"—(Stalin's Russia, by S. Labin, p. 63)

অর্থাৎ: "সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায়ই নাম এবং উপাধির পরিবর্তন হয়। ষ্ট্যালিনের কেন হয় না? বর্তমান উপাধি আর তার শোভা পায় না। এখন তাঁহাকে সমগ্র রাশিয়ার ফারাও তৃতীয় নেক্‌টানেবো উপাধি দিলেই তো হয়।"

রাশিয়ায় প্রেরিত আমেরিকার ভূতপূর্ব রাজদূত Joseph E. Davies তাঁহার 'Mission to Moscow' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:

"The Government is a Dictatorship, not of the proletariat, as professed, but over the proletariat. It is completely dominated by one man.

অর্থাৎ: সোভিয়েট রাশিয়ায় ডিক্টেটরশিপ প্রচলিত; ডিক্টেটর এখন আর পূর্বপ্রতিশ্রুত শ্রমিক সাধারণের ডিক্টেটর নহেন, এখন তিনি শ্রমিক সাধারণের উপরে ডিক্টেটর। ইহা সম্পূর্ণরূপে একজন লোকেরই কর্তৃত্বাধীন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যে এখন কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিরই স্বৈর-শাসন চলিয়াছে, তার আর এক প্রমাণ এই যে, সমগ্র রাশিয়ার লোক সংখ্যার শতকরা ৩ জন হইল কমিউনিষ্ট। ("Only 3 percent of the total population of the Soviet Union is Communist"--Stalin's Russia, p. 51) ইহা দ্বারাই বুঝা যায়

কিরূপ কঠোর হস্তে এই কমিউনিস্ট পার্টি সকল লোককে স্ববশে রাখিয়াছে। কমিউনিজমের প্রতি যদি সর্বসাধারণের এত আগ্রহই থাকিবে, তবে তাহারা কেন কমিউনিস্ট হয় না ?

বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়াকে এখন আর সাম্যবাদী বলা চলে না। নামে না হইলেও, কাজে সে এখন পুরাদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিবাদী। সাম্যবাদের নামে এমন ধোঁকাবাজী আর দেখা যায় না। সোভিয়েট রাশিয়া এখন প্রকৃতপক্ষে 'British Commonwealth'-এরই অনুরূপ। অথবা ইহাকে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনের রাষ্ট্র-আদর্শও বলা যায়। Mr. Masani ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

"Actually a third variety of State is not only possible but is already coming to existence and one of the countries where you can see it to-day is Russia."—Socialism Re-considered : p. 28.

(৫) জাতীয়তা (Nationalism)-কে দূর করিয়া আন্তর্জাতীয়তা (Internationalism) স্থাপনই ছিল কমিউনিজমের স্বপ্ন। কিন্তু সে-স্বপ্নও মিলাইয়া গিয়াছে। জাতীয়তার দিকেই পুনরায় সোভিয়েট রাশিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

(৬) কমিউনিস্টদের প্রস্তাবনা ছিল ঃ শুধু রাশিয়াতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে না, অন্যান্য দেশেও তাহারা নিজেদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা বিপ্লব ও রক্তপাত ঘটাইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তাহারা মস্কোতে Communist International বা Comintern স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশেষ।

এই কমিনটার্ন ছিল অন্যান্য নন্-কমিউনিস্ট দেশের পক্ষে মস্ত-বড় একটা বিভীষিকা। আশ্চর্যের বিষয়, গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের

শেষভাগে স্ট্যালিন এই Comintern ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ফলে জোর করিয়া ভিন্ন দেশে কমিউনিজ্‌ম্‌ চালাইবার সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। Comintern-এর পরিবর্তে এখন Cominform স্থাপিত হইয়াছে। ইহা আত্ম-গঠনমূলক, আক্রমণমূলক নয়। কমিউনিজম এখানে নিজ আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে একেবারে নামিয়া পড়িয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য শক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপন না করিলে সোভিয়েট রাশিয়ার চলে না ; তাই বাধ্য হইয়া সে তাহার মূলনীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত এইখানে কমিউনিজ্‌মের আপোষ হইয়াছে।

(৭) পুঁজিবাদকে ধ্বংস করাই কমিউনিজমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মার্কসের দর্শন অনুসারেই দেখা যাইতেছে ঃ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলেই আসে কমিউনিজম, অর্থাৎ ঃ পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমবাদীরা আনিবে সংঘর্ষ, তার ফলে জন্মলাভ করিবে কমিউনিজম। এখানে পুঁজিবাদ হইল thesis, শ্রমবাদ হইল antithesis, আর সাম্যবাদ (Communism) হইল synthesis, কাজেই দেখা যাইতেছে, কমিউনিজ্‌ম্‌কে আনিতে হইলে পুঁজিবাদ অপরিহার্য। পুঁজিবাদ ছাড়া কমিউনিজ্‌ম্‌কে কল্পনাই করা যায় না। কমিউনিজ্‌মের সওদা করিতে হইলে পুঁজিবাদের মূলধন হাতে লইয়াই বাহির হইতে হয়, নতুবা কমিউনিজ্‌ম্‌কে পাওয়া যায় না। অথচ সেই পুঁজিবাদকে নিন্দা করিবার বেলায় কমিউনিস্টরা শতমুখ !

(৮) মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism)-ও বাস্তবতাশূন্য নিছক কল্পনা। মার্কস বলেন ঃ জগতের ইতিহাস শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস। (The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles.) আজাদ ও গোলামে, ধনিক ও শ্রমিকে, জালিম ও মজলুমে—যুগে যুগে চলিয়াছে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ (uninterrupted struggle) ; তারি ফলে দেশে দেশে রচিত হইতেছে ইতিহাস। কিন্তু মার্কসের এই থিওরী জগতের

ইতিহাস সমর্থন করে কি? নিশ্চয়ই না। দাস-মুক্তির ইতিহাসের কথাই ভাবুন। মার্কসের থিওরী অনুসারে যুগে যুগে দাসেরা করিয়াছে মনিবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাহারই ফলে লাভ করিয়াছে তাহারা আজাদী। কিন্তু একথা একেবারে মিথ্যা। দাসেরা যুদ্ধ করিয়া নিজেদের মুক্তি আনে নাই। মহামানব হযরত মোহাম্মদ এবং লিঙ্কন প্রমুখ উদারমনা মহৎ ব্যক্তিদের চেষ্টাতেই দাস-মুক্তি আসিয়াছে।

আলেকজান্দার যখন পারস্য আক্রমণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস। আবার পারস্য সম্রাট দরিয়াসের অধীনেও ছিল অগণিত ক্রীতদাস। কিন্তু যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন আলেকজান্দারের দাসগণ দরিয়াসের দাসদের সঙ্গে মিলিয়া সম্রাটদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল কি? বরং তার উল্টো। আলেকজান্দারের ক্রীত দাসেরা স্বীয় প্রভুর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া দরিয়াসের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে লড়াই করিল। দরিয়াসের ক্রীতদাসেরাও সেইরূপ স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় নিজ প্রভুর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া আলেকজান্দারের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। কোথায় রহিল তবে শ্রেণী-সংঘর্ষ?

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়ঃ এখানে শ্রেণী সংঘর্ষের কোন কথাই নাই। শূদ্রেরা কবে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে? prof. Brij Narain তাই ঠিকই বলিয়াছেনঃ "If all history is class-struggle, India has no history at all" অর্থাৎঃ সমস্ত ইতিহাসই যদি শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস হয়, তবে ভারতের কোন ইতিহাসই নাই।

বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের পানে তাকান! কোন্ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে এই দুইটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল? পুঁজিপতি আমেরিকা সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যোগ দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করিল? তুর্কী কেন জার্মানীর স্বপক্ষে যোগ দিল?

হালাকু খাঁ কেন বাগদাদ ধ্বংস করিল? মুসলমানদিগের অধঃপতন কেন হইল, আবার কেনই বা আজ দিকে দিকে ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া উঠিল? পাকিস্তান কেন আসিল? কেন শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে এতগুলি কাণ্ড ঘটিল? মার্কসের থিওরী এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার একটিরও কোন ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(৯) "Workers of the world, unite" (জগতের শ্রমিক দল এক হও)—ইহাই ছিল মার্কসের বাণী। এ বাণীও সফল হয় নাই। ইংলণ্ডের শ্রমিক দল জার্মানী, রাশিয়া এবং আমেরিকার শ্রমিক দলের সহিত মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য কোথাও যুদ্ধ করিয়াছে কি না। যুদ্ধ বাধিলেই দেখা যায়, প্রত্যেক দেশের শ্রমিক-দল তাহাদের নিজেদের দেশের রক্ষাকল্পে অপর দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইংলণ্ডের বা আমেরিকার শ্রমিকদল জানে, ইংলণ্ড বা আমেরিকা ধ্বংস হইলে তাহাদের রুজি-রোজগার ও সুখ-সুবিধা মিলিবে না।

(১০) মার্কস গোড়াতে অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ

"Abolish slavery and you will have wiped America of the map nations" অর্থাৎঃ দাস-প্রথা তুলিয়া দিলে ম্যাপে আমেরিকার অস্তিত্বই থাকিবে না। আমেরিকায় দাস প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কৈ, আমেরিকা ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই? বরং সে এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র।

(১১) মার্কসের অর্থনৈতিক থিওরীও ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি চাহিয়াছিলেন মুদ্রাহীন অর্থনীতি (moneyless economy,) অর্থাৎ আজকাল যেমন অর্থ দ্বারাই সমস্ত জিনিষের লেন-দেন চলে, মার্কস এ প্রথা তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কুলি, মজুর, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিয়া যাইবে, তার

বিনিময়ে তাহারা বেতন পাইবে না, পাইবে তাহাদের যাবতীয় অভাবের জিনিসপত্র। কৃষক জমি চাষ করিয়া ফসল ফলাইয়া ষ্টেটকে দিল, ষ্টেট তাহার ভাত-কাপড় সরবরাহ করিল। আদিম যুগে যেরূপ পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় হইত, মার্কসের মনেও ছিল সেই পরিকল্পনা। মুদ্রা প্রথা তিনি এইজন্য তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে উহা পুঁজিবাদেরই বাহন এবং সাম্যবাদের ঘোর পরিপন্থী। কিন্তু মার্কসের এ আশা সফল হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেনিন মুদ্রা-বিনিময় প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটায়, বাধ্য হইয়া তিনি আবার মুদ্রা-প্রথারই প্রচলন করেন। বিতাড়িত রুবল (ruble) আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্থান দখল করিয়াছে। পুঁজিবাদের প্রধান বাহন মুদ্রাশক্তির নিকট কমিউনিজ্‌ম্‌ এইখানে হারিয়া গিয়াছে।

(১২) দেশের কর্মশক্তি বাড়াইবার জন্য মার্কস যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও কার্যকরী হয় নাই। কার্যে দক্ষতা ও আন্তরিকতা দেখাইলে কর্মচারীর পদোন্নতি হয় ও বেতন বাড়ে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মার্কস এরূপ তারতম্য পছন্দ করেন নাই। বেতনের হারের সমতাই ছিল তাহার কাম্য। যাহাকে যেখানে যে কাজে লাগান যাইবে, সে সেই কাজই দক্ষতার সহিত করিবে; ব্যক্তিগত পদোন্নতি বা স্বার্থের কথা না ভাবিয়া তাহারা ভাবিবে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের কথা, সমষ্টিগত কল্যাণের কথা—ইহাই ছিল মার্কসের নির্দেশ। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় এ ব্যবস্থা বিফল হইয়াছে। ভাল কাজ করিলে পদোন্নতি হইবে বা বেতন বাড়িবে অথবা যে যত উৎপন্ন করিবে, সে ততই বেশী অর্থ পাইবে—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রেরণা না থাকিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সমষ্টিগত কল্যাণ-বোধ কর্মীকে যতটা না কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে, তার চেয়ে বেশী করে ব্যক্তিগত কল্যাণবোধ। এই সত্য সোভিয়েট রাশিয়া পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি

করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন আর বেতনের হারের সমতার কোন কথা নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিন ঘোষণা করিয়াছিলেন: "The salaries of the highest official should not exceed the average salary of a good worker." (অর্থাৎ: রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন একজন ভাল শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা বেশী হইবে না।) তিনি এই নির্দেশও দিয়াছিলেন যে, কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন ৫০০ রুবলের বেশী হইবে না। কিন্তু ষ্ট্যালিনের হাতে আসিয়া এই নির্দেশ এখন কোথায় গিয়া নামিয়াছে, রাশিয়ার বর্তমান বেতন ও আয়ের হার লক্ষ্য করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন:

কর্মীর পরিচয়		বেতনের নিম্নতম এবং উচ্চতম হার
(১) সাধারণ শ্রমিক	...	৮০—৪০০ রুবল
(২) ক্ষুদ্র কর্মচারী	...	৮০—৩০৯ রুবল
(৩) উচ্চপদস্থ কর্মচারী (বিচারক, বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর, হাকিম ইত্যাদি)	...	১৫০০—১০,০০০ রুঃ
(৪) সাধারণ শ্রমিকদের পেনশন	...	২৫—৫৮০ রুঃ (অন্য কোন সুবিধা নাই)
(৫) উচ্চ কর্মচারীদের অথবা তাহাদের বিধবা ও সন্তানদের পেনশন	...	৭৫০—১০০০ রুঃ (ইহার সহিত বাসগৃহ, ছেলে-মেয়েদের স্কলারশীপ ইত্যাদি সুবিধা আছে)

কমরেড ইভন (Comrade Yvon) নামক একজন ফরাসী কমিউনিষ্ট বলেন: বর্তমানে রাশিয়ায় আয়ের হার ২৫ রুঃ হইতে ৩০,০০০ রুঃ (অর্থাৎ: ৫ টাকা হইতে ৬০০০ টাকা)। একজন

ইঞ্জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞ একজন শ্রমিক অপেক্ষা গড়ে ১০০ গুণ বেশী বেতন পায়। শ্রমিকদের মধ্যেও যাহারা কর্মদক্ষ (Slaknovist), তাহারা সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা ৫/৬ গুণ বেশী বেতন পায়। G.P.U. গুপ্ত-পুলিশের বেতন ও সুখ-সুবিধা অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বেশী।

এই হারের সহিত ইংলন্ড এবং আমেরিকার বেতনের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে ঃ ইংলন্ড ও আমেরিকা পুঁজিবাদী হইয়াও যে-হারে বেতন দেয়; সোভিয়েট রাশিয়া কমিউনিস্ট সাজিয়াও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হারে বেতন দেয়। আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

ফ্যাক্টরীর নাম	বেতনের হার
'hili Copper Company ...	1 : 41
Curtis Publishing Co. ...	1 : 51
Consolidated Oil Co. ...	1 : 82

অতএব দেখা যাইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিকেরা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকদের অপেক্ষা সুখেই আছে, তাহা নয়। বরং শ্রমিকদের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় আরো শোচনীয়। prof. Brij Narain তাঁহার "Marxism is Dead" নামক বিখ্যাত পুস্তকে অকাট্য রূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকদের বেতনের হার এমন কি বোম্বাই এবং লাহোরের মিল-মজুরদের বেতনের হার অপেক্ষাও কম।

তাহা হইলে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় বেতনের সমতা রক্ষা করা ত দূরের কথা, বেতনের তারতম্য সেখানে অন্যান্য দেশ হইতে আরো বেশী।

সোভিয়েট রাশিয়ার রেল, ষ্টিমার এবং সিনেমাতে অন্যান্য দেশের মতই ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী--এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ রহিয়াছে।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন শ্রেণী-হীন সমাজ গঠিত হয় নাই—হইবেও না। কাজেই বলা যায়,

মার্কসের একটি প্রধান নীতি এবং অঙ্গীকার এইখানে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে।

(১৩) পুঁজিবাদ এবং সেই সঙ্গে শোষণ (exploitation)-এর সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দেওয়াই ছিল কমিউনিজমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সে আশাও সফল হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে বহু ষ্টেট ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। সেখানে ব্যক্তিগতভাবেই লোকেরা টাকা জমা রাখে। লোকদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি উচ্চহারে সুদ দেয়। সোভিয়েট রাশিয়ার এখন যার যত খুশি রোজগার করিতে পারে, কিন্তু 'ষ্টেটবণ্ড' (State-bond) ক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায়ে তাহারা সে টাকা খাটাইতে পারে না। ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলির সুদও খুব বেশী ঃ শতকরা ৮। সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রচলনও সেখানে যথেষ্ট আছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় মোট ৪৩,০০,০০০ সেভিংস ব্যাঙ্ক ছিল। সেভিংস ব্যাঙ্কও খুব উচ্চ হারে সুদ দেয় ঃ শতকরা ৮ হইতে ১০। তাহা হইলে পুঁজিবাদে আর কমিউনিজমে তফাৎ রহিল কোথায়? এই ভাবে বিনা পরিশ্রমে আয় বৃদ্ধি করাও ত exploitation. এই জন্যই একজন লেখক সোভিয়েট রাশিয়ার এই বিপ্লবকে "Revolution without, no change within" অর্থাৎ ঃ বাহির বিপ্লব, ভিতরে কিছুই না—এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। (Islam and Socialism—by Mirza Md. Hossain, p. 124)

(১৪) কমিউনিজম্ দিতে চাহিয়াছিল পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা ধর্মকে ধ্বংস করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়-ঘোষণা। স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ও মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশই ছিল কার্ল মার্কসের একমাত্র ধ্যান। কমিউনিস্টরা এই ব্যক্তিস্বাধীনতার বড়াই খুবই করিয়া থাকে। Soviet Constitution (রাষ্ট্রতন্ত্র)-কে তাই তাহারা বলে ঃ "The greatest democratic of all time," অর্থাৎ ঃ সর্বকালের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ

গণতান্ত্রিক বিধান। কিন্তু কার্যতঃ আমরা কী দেখিতে পাই? আজ দেখা যাইতেছে ঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা বা নিরাপত্তা আদৌ নাই। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের বিরূদ্ধে কেহই কোন সমালোচনা করিতে পারে না, স্বাধীন ভাবে কেহই কোন কথা বলিতে পারে না। সোভিয়েট রাশিয়ায় দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক দল (Political party) নাই। কমিউনিষ্ট পার্টি'ই সেখানে একমাত্র দল। বৃটিশ সাম্রাজ্য বা আমেরিকায় স্বাধীনভাবে গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা করার অধিকার আছে, প্রেস ও প্লাটফরমের স্বাধীনতা আছে; কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় সেরূপ কিছুই নাই। সেখানে সরকার হইতে একইভাবে চিন্তা করান হয়, একইভাবে কথা বলান হয়, একইভাবে কাজ করান হয়। ইহাকে বলে regimentation. সৈন্যদলকে যেরূপ যাহা শিখানো হয় তাহাই বলে ও ভাবে, কমিউনিষ্টদের অবস্থাও তদ্রূপ। অফিসে, আদালতে, স্কুলে, থিয়েটারে—সর্বত্রই একই মত, একই ধরন, একই পথ। কমিউনিজ্‌ম্‌ই যে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ যে অত্যন্ত জঘন্য; ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী ও ইটালী হইতে যে রাশিয়ার শাসন-পদ্ধতি ও অন্যান্য সবকিছুই ভাল এই সমস্ত কথা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ছোটবেলা হইতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সংবাদপত্রে কেহ কোনরূপ বিরূদ্ধ সমালোচনা করিতে পারে না। সকলেই থাকে ভয়ে ভয়ে, চুপে চুপে। হিটলারের Gestapo-র ন্যায় G. P. U. নামক গুপ্ত পুলিশের আতঙ্ক সেখানে অত্যন্ত প্রবল। কাহারো বিরুদ্ধে একটু রিপোর্ট করিলেই আর রক্ষা নাই। ১৯৩৬-৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে The Great Moscow Trials-এর সময় হাজার হাজার নিরীহ লোককে বলশেভিক পার্টি অমূলক সন্দেহে অথবা সামান্য কোন মতবিরোধের দরুন গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। পার্টির একটু কিছু বিরুদ্ধতা করিলেই আর রক্ষা নাই। মাঝে মাঝে পার্টির লোককে বাছাই (Purging) করিবার সময়ও বহুলোকের প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন হইয়া

থাকে। সেখানকার বিচারও অদ্ভুত। কার যে কী অপরাধ, তাহা বলা হয় না, কাহাকেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবারও অধিকার দেওয়া হয় না। একদিন হয়ত কোন এক শ্রমিককে পুলিশ ধরিয়া লইয়া জেলে পুরিল; বেচারা আর বাড়ী ফিরিল না। ইহাতেই তাহার স্ত্রী বুঝিল, তার স্বামী বন্দী হইয়াছে। বাড়ী হইতে স্ত্রী হয় ত রোজ স্বামীর খাবার লইয়া গিয়া জেলের কর্তৃপক্ষের মারফৎ পেঁছাইয়া দিতে লাগিল; কিন্তু হঠাৎ একদিন হয় ত জেল কর্তৃপক্ষ স্ত্রীলোকটির খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দিল। ইহাতেই স্ত্রীলোকটি বুঝিল যে তাহার স্বামীকে হত্যা করা হইয়াছে। শুধু যে শ্রমিকদের বেলাই এরূপ তাহা নহে। বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও রেহাই পান নাই। মতানৈক্যের ফলে বহু নেতাকেই জীবন হারাইতে হইয়াছে। Marz Eastman বলেন ঃ

"The list of those shot or who shot themselves or who were named as implicated with the victims comprises with a single exception, every one of the eminent Bolsheviks who sat with Stalin around the council Table of Lenin ; Trotsky, Zinoviev, Kanemew, Rykov. Bukharin, Radek Sokolnikov, piatakov (mentioned in Lenin's statement as among the ablest) Yevdokimov, Smirov (once known as the Lenin of Siberia). Tommsky (head of the Federation of Labour) and several others only little less eminent." —(Economics of Islam– p. 81.)

অর্থাৎ ঃ যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে অথবা যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকার মধ্যে ট্রটস্কি; জিনোভিভ, ক্যানেমিউ, রাইকভ—ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন।

ষ্ট্যালিন সম্বন্ধে Eastman আরও বলিতেছেন ঃ

"If the shedded blood of innocent men were measured, Stalin's would be a lake, Hitler's a duck pond, Mussolini's could be dipped up by the tank-cartful."

অর্থাৎ ঃ নিরীহ লোকদের যত রক্তপাত করা হইয়াছে তাহা যদি মাপা যাইত, তবে ষ্ট্যালিনের হইত একটা হ্রদ, হিটলারের হইত একটা ডোবা আর মুসোলিনীর হইত একটা ছোট জলাধার।

ইহাই কি সাম্যবাদ ? ইহাই কি মানুষের মুক্তি বা ত্রাণ ? একজন সমালোচক তাই কমিউনিজমকে উদ্দেশ্য করিয়া ঠিকই বলিয়াছেন ঃ "The unsocial Socialism !"

ইহারই বিনিময়ে মানুষকে যদি দু'মুঠো খাবার বেশি করিয়াই দেওয়া হয়, তবে তার চেয়ে নিষ্ঠুর ছলনা আর কী হইতে পারে ? কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে ঃ "What man has made of man !"

এই ধরনের বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। আশা করি পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন ঃ মার্কস্‌বাদ একটা বহ্বাড়ম্বর মাত্র, ভিতর এর একদম ফাঁপা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় নারী-প্রগতি

নারীর মুক্তিদান কমিউনিজমের অন্যতম কীর্তি। এই কীর্তির কথা কমিউনিষ্টরা জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকে। এই প্রচারণার মূলে কতখানি সত্য আছে, এইবার তাহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

অবশ্য নারী-প্রগতির আধুনিক অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন নারী-পুরুষে কোন প্রভেদ নাই ; নারীকে পুরুষের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ছেলে ও মেয়েদিগকে তুল্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়; মেয়েদের স্বাস্থ্য, আহার, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ছেলেদের মতই যত্ন লওয়া হয় ; কোন ক্ষেত্রেই কোনরূপ তারতম্য করা হয় না। ফ্যাক্টরীতে মেয়েরা কাজ করিতে পারে, সৈন্য সাজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে পারে, মোটর কার ও এরোপ্লেন চালাইতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার হইতে পারে, শিক্ষক ও নার্স হইতে পারে, সিনেমার অভিনেত্রী হইতে পারে, অবাধে যেখানে-সেখানে বিচরণ করিতে পারে। বস্তুতঃ মেয়েদের স্বাধীন গতি-বিধিতে কোথাও কেহ বাধা দিবার নাই। কমিউনিজ্‌ম্ শুধু যে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সাম্যই আনিয়াছে, তাহা নহে, যৌন-জীবনেও সে আনিয়াছে সাম্য। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে Soviet Constitution-এ নারীজাতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সনদ দেওয়া হইয়াছে ঃ

"Women in the U. S. S. R. are accorded equal rights with men in all fields of economic, State, cultrral, social and political life .. ... The possibility

of realising these rights of women is ensured by affording women, eqully with men, the right to work, payment for work rest, social insurance and education, State protection in the interest of mother and child granting pregnancy leave with pay and provision of a net work of maternity homes, nurseries and Kindergartens.

অর্থাৎ ঃ সোভিয়েট রাশিয়ার নারীদিগকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক—সর্বক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া হইল। —এই অধিকার যাহাতে তাহারা ভোগ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে পুরুষের মতই কর্ম, বেতন, ছুটি, শিক্ষা, নিরাপত্তা, গর্ভাবস্থায় ছুটি, ধাত্রীগৃহ, শিশু-শিক্ষাগার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হইল।

সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতেও এই প্রগতির ঢেউ লাগিয়াছে। বোখারা, সমরকন্দ, আজারবাইজান ইত্যাদি দেশেও মুসলিম নারীরা আজ নূতন জীবনের আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। বোরকা ছিঁড়িয়া তাহারা মুক্ত আলোকে পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতএব বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় ঃ—সোভিয়েট রাশিয়ার নারীরা সত্যই মুক্তি পাইয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্‌ আসিবার পূর্বে এইসব সুখ-সুবিধা নারীরা কখনও ভোগ করিতে পারে নাই। কমিউনিজ্‌ম্‌ এই হিসেবে সত্যই নারীদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ইহাই কি সত্যিকার নারী-প্রগতি ? ইহাই কি নারীর প্রকৃত মর্যাদা দান ? নরনারীর অবাধ মেলা-মেশা, সিনেমাতে অভিনয় করা, পর-পুরুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করা, মোটর বা এরোপ্লেন চালনা করা—ইহাই কি সব ? এর বেশী আর কিছু চাহিবার নাই ?

এখানে কমিউনিজ্‌মের চিরাচরিত নীতি নারীদের বেলাও প্রয়োগ করা হইয়াছে, বাহিরে চটকদার কিছু দিয়া ভিতর হইতে যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কমিউনিজ্‌ম্‌ যে নারী-জাতির প্রতি নিছক দরদ-বশতঃই তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাহা নহে। কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত নারী-জাতির এই মুক্তিদানের সামঞ্জস্য আছে। পাঠক জানেন, কমিউনিজম ক্যাপিট্যালিজমের ঘোর শত্রু। শুধু ক্যাপিট্যালিজম নয়, ক্যাপিট্যালিজমের গন্ধ যাহাদের গায়ে আছে, সে সব জিনিসকেও কমিউনিষ্টরা দুচোখ পাতিয়া দেখিতে পারে না। এই জন্য পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সাম্রাজ্য এবং পরিবার(family)-কে ধ্বংস করাও কমিউনিষ্টদের অন্যতম লক্ষ্য, কারণ তারা মনে করে, সমাজ, সাম্রাজ্য এবং পরিবার—এ তিনই পুঁজিবাদের বাহক ও সমর্থক। তাহাদের মতে পরিবারের বুনিয়াদ ধনতান্ত্রিক ; মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজন লইয়া এক একটা পরিবার ঠিক যেন এক একটা ছোটখাট সাম্রাজ্য। পরিবারের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিলেই মাতা-পিতা বা অন্যান্য গুরুজনের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ হইলে আর সাম্য বা ব্যক্তিস্বাধীনতা রহিল কোথায় ? এ ত ঠিক পূর্বের সেই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই মানিয়া লওয়া হইল। কাজেই ভাঙ্গ এই পরিবারের স্নেহের নীড়। ভাঙ্গ প্রাচীন বুর্জোয়া সমাজের এই ইটগুলি বা 'ইউনিট' (unit) গুলি আর উড়াও সাম্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিজয়-কেতন!

ইহাই হইল নারী-মুক্তির গোপন রহস্য। প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতাকে ভাঙ্গবার জন্য প্রয়োজন ছিল এই নারী মুক্তির।

Mother Russia-র বিখ্যাত লেখক Maurice Hindus-এর উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করি ঃ

"There were voices of denunciation, loud and fierce, which pointed to the family as the embodiment of the worst evils of Capitalism and deserving annihilation. There were groups, some of youths, which in their disdain of the old society rebelled not only against its economic order, but against its morality, its art, its social usages and of course the Family." —(Mother Russia, p. 240)

অর্থাৎ : পরিবার সম্বন্ধে সকলে এই বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, উহা পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট কুফলের বাহক এবং কাজেই উহাকে ধ্বংস করা উচিত। যুবকেরা প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ঘৃণা করিতে গিয়া শুধু যে উহার অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিল তাহা নহে, উহার নীতি, শিল্প, সংস্কার এবং বিশেষ করিয়া পরিবারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিল।

ইহার ফল যাহা হইবার হইয়াছে। অর্থনৈতিক আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া নারীজাতির আভিজাত্য, সতীত্ব-গৌরব এবং সম্ভ্রমকেও টানিয়া ধূলার আসনে নামাইয়াছে। নারীকেও সে 'Proletarised' (সাধারণ শ্রেণী) করিয়াছে। পূর্বে রাশিয়ান পরিবারে যে স্বাভাবিক প্রেম ও স্নেহ-মমতার বন্ধন ছিল, এখন তাহা নাই বলিলেই চলে। অবাধ যৌন-মিলনের ফলে সমাজে নানা ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা ঢুকিয়াছে। বিবাহ এবং তালাক সেখানে এক গ্লাস পানি খাইবার মতই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিক দিয়া বিবাহের সংখ্যাও যেমন বাড়িতেছে, অন্যদিক দিয়া তালাকের সংখ্যাও ঠিক তেমনি বাড়িতেছে। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রি অফিসে তাই খুব কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। মাটির পানপাত্রে পান করিয়া পাত্রটিকে যেমন ছুঁড়িয়া ফেলা হয়, নর-নারীর সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। আজ

বিবাহ করিয়া কালই হয়ত তাহাকে তালাক দেওয়া হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে বিবাহ এবং তালাক দুই-ই অতি সহজ। যুবক-যুবতী সেখানে ম্যারেজ-রেজিস্‌ট্রি অফিসে গিয়া নাম লিখাইয়া আসিলেই বিবাহ হইয়া যায়, আবার স্ত্রী বা স্বামী যখন যাহার খুশি রেজিস্‌ট্রি অফিসে গিয়া একখানি কার্ড লিখিয়া অপর জনকে জানাইয়া দিলেই বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। Maurice Hindus বলিতেছেন :

"Do you mean," I said, "that on the way to work in the morning a man or woman can stop at a registry office and obtain divorce, and the union is at an end?"

"Precisely," was the proud reply. "The compulsions, with which the former society had beset the individual, a socialist society could not tolerate—"

বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার যৌন-সম্বন্ধ ঠিক এখন হাঁস-মুরগীর যৌন-সম্বন্ধের মতই হইয়াছে। কমিউনিস্টরা এখন হাঁস-মুরগীর নীতিবাক্য ("the morality of the farmyard fowl") মানিয়া চলে। সেখানে আইনসিদ্ধ (legitimate) এবং জারজ (illegitimate) সন্তানে কোনই তারতম্য নাই। জন্ম-নিরোধ (birth control) এবং ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত (abortions)—দুই-ই সেখানে আইনতঃ সিদ্ধ। Maurice Hindus লিখিতেছেন :—"Birth control was fostered, abortions were free and legal"—(Mother Russia; p. 240)

অর্থাৎ : জন্ম নিয়ন্ত্রণে সেখানে উৎসাহিত করা হয়, গর্ভপাতে বাধা নাই, উহা আইনসঙ্গত।

অন্যত্র বলিতেছেন :

"All children were legitimate whether born in or out of wedlock." (Ibid, p. 243)

অর্থাৎ ঃ বিবাহ দ্বারাই হোক অথবা বাহিরেরই হোক, সমস্ত সন্তানই আইনসিদ্ধ।

F. Halle তাঁহার "Woman in Soviet Russia" নামক পুস্তকে লিখিতেছেন ঃ

"Unmarried motherhood is becoming more and more an established institution."

অর্থাৎ ঃ (সোভিয়েট রাশিয়ায়) বিবাহ-বিহীন মাতৃত্ব ক্রমেই একটা স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

এইরূপে যেসব জারজ সন্তান পয়দা হইতেছে, তাহাদিগকে সরকারী শিশু-পালনাগার (creches) লালন-পালন করা হইতেছে।

ইহাকেই কি বলে নারী-প্রগতি। নারীর প্রতি এর চেয়ে চরম আপমান আর কী হইতে পারে? সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া নারীর অন্তরের সকল ঐশ্বর্য, সকল মাধুর্য ও সকল পবিত্রতা অপহরণ করিয়া বাহিরে তাহাকে চাকচিক্যময় রূপসজ্জা দান করা দস্তুর মত মানবতাকেই অপমান করা। একজন লেখক এই সভ্যতাকে তাই বলিয়াছেন—"mechanised barbarism" অর্থাৎ ঃ যান্ত্রিক বর্বরতা। সত্যই তাহা নয় কি?

সোভিয়েট রাশিয়া নারীজাতিকে মর্যাদা দিয়াছে, না চরম অমর্যাদা করিয়াছে, আমাদের মা-বোনেরাই তার বিচার করুন।

সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিক

কমিউনিজমের প্রচারকেরা জোর আওয়াজে কৃষক-শ্রমিক ও সর্বহারাদের গান গাহিয়া বেড়ায়। নিপীড়িত-মজলুমের প্রতি তাহাদের দরদের অন্ত নাই। কমিউনিজম আসিলেই 'সর্বহারার' দল সুখে থাকিবে, ভাত কাপড় পাইবে—শোষক ও শাসক শ্রেণীর অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া নূতন ভূস্বর্গে আসিয়া বাস করিবে, এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়াই কমিউনিস্টরা নিরীহ কৃষক-প্রজা ও শ্রমিকদিগকে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। সরলপ্রাণ কৃষক-প্রজারা সহজেই এসব কথা বিশ্বাস করিয়া অনেক সময় অশান্তি ঘটায়। এই সমস্ত অভিনয়ের পিছনে কোন্ খেলোয়াড় আছে, তাহাদের মতলব কি, প্রচলিত শাসনতন্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহারা কোন্ নূতন হুকুমাৎ জারী করিতে চায় এবং সেই নূতন পরিস্থিতিতে কৃষক-শ্রমিকের দশা কি দাঁড়াইবে, এসব কথা কেহ ভাবিয়া দেখে না। যাহাদের নজির দেখাইয়া কমিউনিস্টরা আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষক-মজুরকে নিজেদের দলে ভিড়াইতে চায়, সেই সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক সমাজ কিরূপ সুখে আছে; সে সম্বন্ধেও তাহাদের মনে কোন জিজ্ঞাসা জাগে না। আমরা তাই এইবার দেখিব ঃ কমিউনিজমের নিজের দেশে (সোভিয়েট রাশিয়ায়) কৃষক, শ্রমিক এবং 'সর্বহারার দল' কিরূপ সুখে আছে।

জারের আমলে অন্যান্য দেশের ন্যায় রাশিয়াতেও জমিদারী-প্রথা বিদ্যমান ছিল, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ভূস্বামীরাই ছিল জমির উৎপন্ন শস্যের মালিক; কৃষকদের নিজস্ব কোনই জমি ছিল না; তাহারা শুধু জন-মজুরের কাজ করিত; অনেক সময় ভূস্বামীরা

তাহাদিগকে বেগার খাটাইয়া মারিত। জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া কমিউনিষ্টরা যখন নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল, তখন সমস্ত জমি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ষ্টেটের অধীনে আসিল। ষ্টেট তখন সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব তুলিয়া দিয়া নূতনভাবে জমি-বিলির ব্যবস্থা করিল। সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষিকার্য আরম্ভ করা হইল। সমবায়-পদ্ধতিটা এরূপ ঃ মনে করুন একটা বড় গ্রাম। সেই গ্রামের সমস্ত জমি লইয়া কোলহোজ (Kolhoze) বা একটা সমিতি গঠিত হইল। সেখানে একটি সরকারী ফার্ম বা গোলাবাড়ী তৈরী হইল সরকার হইতে প্রয়োজনীয় অফিস ও পুলিশ বাহিনী আসিল, কলের লাঙ্গল আসিল, মিস্ত্রি-ড্রাইভার আসিল। তাহারা আসিয়া গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটা সমিতি গঠন করিয়া দিল, ঠিক এখন যেমন গ্রাম্য ঋণদান সমিতিতে করা হয়। (১) নিয়ম হইল, প্রত্যেক নরনারীকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ মাঠে যাইয়া খাটিতে হইবে। কে কিরূপ কাজ করে, কখন আসে, কখন যায়—সবকিছু হাজিরা-বহিতে টোকা হইতে লাগিল এবং সেই অনুসারে তাহাদের দৈনিক মজুরী দেওয়া হইতে লাগিল। শস্য পাকিলে সমস্ত শস্য সেই ফার্মে জড় হইল। তারপর কে কিরূপ কাজ করিয়াছে তাহা বিচার করিয়া কর্মচারীরা প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু শস্য বিতরণ করিয়া দিল ; বাকিটা সরকারী ফার্মেই মজুদ রহিল। ইহাই হইল সমবায় কৃষি-প্রথা বা Colletivisation.

(১) সরকারী কর্মচারীদের দ্বারাই এই সমিতিগুলি চালিত হয়। এই কর্মচারী-সংঘকে "পলিট্‌টডেল (Politotdels) বলা হয়। উহারা কোলহোজের প্রেসিডেন্ট বা মেম্বারকে যে কোন সময় ডিসমিস করিতে পারে।

এই কৃষি-সমিতি (Kolhoze) গঠনের সময়েই কমিউনিষ্ট পার্টির স্বরূপ প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। যাহারা কৃষক-প্রজা ও শ্রমিকদের মুক্তির বুলি আওড়াইয়া গণ-শাসন (proletariat government) প্রবর্তন করিল, তাহারাই সেই কৃষক ও শ্রমিকদের উপরে ভীষণভাবে জুলুম আরম্ভ করিয়া দিল। ঠিক আমাদের দেশের মতই হইল। ইংরেজ যখন আমাদের রাজা ছিল, তখন ১৪৪ ধারার অপপ্রয়োগ লইয়া, পুলিশ জুলুম লইয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ লইয়া কতই না আমরা আন্দোলন চালাইলাম। কিন্তু যেই আমরা স্বাধীন হইলাম, অমনি সেই বহুনিন্দিত ১৪৪ ধারা আমরাই আবার আমাদের দেশবাসীর উপর অবলীলাক্রমে চালাইয়া গেলাম, সংবাদপত্রের টুঁটি চাপিয়া ধরিলাম, বিপ্লবীদিগকে পুলিশ দ্বারা গুলি করিয়া মারিলাম আর বহু লোককে জেলে পাঠাইলাম। সোভিয়েট রাশিয়াতেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটিল। জার আমলের উৎপীড়ন সমানই চলিল, শুধু হাত বদলই হইল মাত্র। বরং পূর্বের চেয়ে কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। লাঙ্গল, বীজ, উৎপন্ন শস্যের ভাগ, খাওয়া, পরা সব কিছুর জন্যই তাহারা এখন সম্পূর্ণরূপে ষ্টেটের মুখাপেক্ষী হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীন গতিবিধি কিছুই তাহাদের রহিল না। ষ্টেটই হইল এখন তাহাদের জমিদার।

এই কৃষি-সমিতি কি সহজে গঠিত হইল। কৃষকেরা রীতিমত বিদ্রোহী হইল। সরকারও ছাড়িবার পাত্র নহেন। ২৫,০০০ বাছা বাছা বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট সৈন্যকে বহুসংখ্যক গুপ্ত পুলিশের সঙ্গে পাঠান হইল গ্রামে গ্রামে—এই সব বিদ্রোহীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য। ইহারা গিয়া কি করিল? শুনুন ঃ

"Many were killed at their battle posts, others remained away for years without seeing their families."

(অর্থাৎ ঃ তাহারা গিয়া বহুলোককে হত্যা করিল এবং বহুলোক দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।)

এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোককে গুলি করিয়া অথবা নির্বাসিত করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রামে গ্রামে কোলহোজ গঠন করিল।

এই ব্যাপারে কত কৃষক ধ্বংস হইল, জানেন ?

"No less than 6,00,000 peasants and Kolhoze members had been expelled–that is to say, in practice sent to their deaths and only 28 p. c. of the presidents of the Kolhozes prior to 1945 still held their posts." (Stalin's Russia, p. 60)

অর্থাৎ ঃ কম্-ছে-কম্ ছয় লক্ষ কৃষক ও কোলহোজ মেম্বরকে নির্বাসিত করা হইল, তার মানে তাহাদিগকে মৃত্যুর গহ্বরে পাঠান হইল। মাত্র শতকরা ২৮ জন কোলহোজ প্রেসিডেন্ট ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার নানা স্থানে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং তাহাতে অসংখ্য লোক মারা গেল।

আমাদের দেশে একটু অবস্থাপন্ন কৃষকদিগকে আমরা যেরূপ 'গৃহস্থ' বলি, রাশিয়াতে সেইরূপ কৃষকদিগকে বলা হয় 'কুলাক' (Kulak)। এই কুলাক-শ্রেণীকে কমিউনিষ্ট পার্টি একেবারে ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছে। এখন যাহারা কৃষক আছে, তাহারা অতি দরিদ্র ও মেরুদণ্ডহীন ; তাহাদের মধ্যে কোনই শক্তি নাই।

এই কুলাক-শ্রেণীর ধ্বংস ব্যাপার কমিউনিষ্টদের চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় ঃ

"The liquidation of Kulaks has entailed the life of several hundred thousand peasants. Even the

best admirers of Russia have found it difficult to defend the liquidation of Kulaks. An American communist describes it as 'the most spectacular act of ruthlessness which occurred in these years" (Economics of Islam—p.81.)

অর্থাৎ ঃ কুলাকদিগকে ধ্বংস করিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষকের প্রাণ নাশ করা হইয়াছে। এমন কি রাশিয়ার অতি বড় স্তাবকেরাও এই কুলাক-ধ্বংস কার্যকে সমর্থন করিতে পারে না। একজন আমেরিকান কমিউনিষ্ট বলেন ঃ কুলাক বিনাশ ঐ যুগের একটা প্রধান নিষ্ঠুরতার নিদর্শন।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্রই এখন কোলহোজ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু কাজ কিছুই ভাল হইতেছে না। কৃষকেরা গা লাগাইয়া কাজ করে না, কাজেই ফসলও আশানুরূপ হয় না। কৃষক ও মজুরদিগকে অতি কষ্টে দিন গুজরান করিতে হয়। তারা প্রায়ই কোন বিশ্রাম পায় না। যে জিনিস তারা খায়, তার খাদ্য-মূল্যও বেশী নয়।

"Food is often of poor and even bad quality. Trud of January 8, 1939 complains that half the potatoes offered for sale are mouldy ; the **Volgaskaya Kommuna,** No. 89 of 1936 complains of foreign bodies in the bread, such as iron filings, lumps of salt and coagulated grease." (Stalin's Russia, p. 199)

অর্থাৎ ঃ খাদ্যদ্রব্য অতি নিকৃষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর। বাজারে যে আলু বিক্রয় হয়, তার অর্ধেকই পোকা ধরা, রুটিতে চর্বি ইত্যাদি অনেক জিনিস ভেজাল পাওয়া যায়।

ইহাই হইল সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থা !

শ্রমিকদের অবস্থাও কৃষকদের মতই হইল। সমস্ত কল-কারখানা যখন ষ্টেটের হাতে আসিল, তখন শ্রমিকদিগকে সেখানেই কাজ করিতে বাধ্য করা হইল। নূতন নূতন ফার্ম ও কলকারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদিগের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। কৃষকদের মত শ্রমিকদিগের উপরেও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কর্তৃত্ব চালাইতে লাগিল। মানুষ মেশিনে পরিণত হইল। একটু কামাই করিলে বা কাজে শৈথিল্য করিলে আর নিস্তার নাই। এইরূপে দিনরাত নারী-পুরুষেরা কল-কারখানায় কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু এত করিয়াও সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য মোটেই আশানুরূপ হইতেছে না। বিশ্বের বাজারে সোভিয়েট রাশিয়ার কোন দ্রব্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ হয়ত এইখানে বলিবেন, সোভিয়েট শিল্প বা ব্যবসা-নীতি ত ধনতান্ত্রিক নয়, কাজেই তাহারা কোন দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রয় করে না, নিজেদের প্রয়োজন মত তাহারা উৎপন্ন করে এবং নিজেরাই তাহা ভোগ করে। ভাল কথা, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনই বা তাহারা ভালভাবে মিটাইতে পারিতেছে কৈ? শিল্পের প্রসার হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রমিক দিগের অন্ন-বস্ত্র এবং বাসগৃহের সমস্যা দিন দিনই অতি তীব্র হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বাসগৃহের জন্য গড়ে যে জায়গা দেওয়া হইতেছে, তাহা এক একটি সমাধি-শয্যা ("the size of a coffin.)অপেক্ষা বেশী নয়। বেশীর ভাগ স্থানই বড় বড় কারখানায় জুড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই সেখানে জায়গার এত অভাব।

কিন্তু এত তোড়জোড় সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার কারখানায় তৈরী কোন দ্রব্যই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইতেছে না। সোভিয়েট রাশিয়ার জিনিসপত্র কিরূপ অকেজো, নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে তাহা বুঝা যাইবে:

"Rudzutak, a former member of the political Bureau has admitted openly that the majority of

the articles manufactured in the Soviet Union are almost useless. Thousands of complaints about the deplorably low level of quality in Soviet manufactured gods have found their way into the columns of the Soviet press. According to Za Industrializatoin the quality of cotton goods is so poor that resistance to washing is 66 p. c. below normal. A tremendous proportion of the elctric light bulbs manufactured in the Soviet Union give no more than a couple of days service. Certain categories of boots and shoes are completely worn out after a month's use." (Stalin' Russia p. 198)। অর্থাৎ: সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকাংশ দ্রব্যই অকেজো। খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ ছাপা হয়। সূতী বস্ত্র, জুতা ইত্যাদি অতি অল্পদিনেই ছিঁড়িয়া যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার ইহাই একটু নমুনা মাত্র। বাহির হইতে কোন পরিব্রাজক সোভিয়েট রাশিয়ায় বেড়াইতে গেলে তার পেছনে থাকে সরকারের সতর্ক পাহারা। বাছা বাছা স্কুল, কলেজ, ফার্ম, সিনেমা, দোকান ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হয় এবং সেইগুলিই বৈদেশিকদিগকে দেখান হয়।

শ্রমিকদিগের বেতন, বাসগৃহ, ভাতা ইত্যাদি ব্যাপারেও বাহিরে যাহা প্রচার করা হয়, ভিতরে তাহা নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার নারীরা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া কতই না ফখর করা হয়। "Equal pay for equal work" (সমান কাজের জন্য সমান বেতন) বলিয়া কতই না ঢাক-ঢোল পিটান হয়! কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাই? একই ধরনের কাজে নারীকে কিছুতেই পুরুষের সমান সমান

বেতন দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট দৈনিক কে কতখানি কাজ করে, তাহাই দেখিয়া বেতনের হার নির্ধারিণ করে। নারী বলিয়া সেখানে এতটুকু অনুগ্রহ নাই। যেহেতু নারিরা পুরুষের মত খাটিতে পারে না, সেইজন্য তাহাদের বেতন পুরুষদিগের বেতন অপেক্ষা অনেক কম। নারীরা যতদিন কুমারী বা যুবতী থাকে, ততদিন তাহাদের আদর করা হয়, কিন্তু গর্ভবতী বা বৃদ্ধা নারীরা নিতান্তই অবহেলার পাত্রী ঃ

"In the Soviet Union, there are cases of working girls being dismissed by their superiors for Pregnancy."

(—Stalin's Russia, p. 271)

যে নারীর দুই-তিনটি সন্তান হইয়াছে, সে প্রায়ই কাজ পায় না। গর্ভবতী নারীদিগকে অবশ্য মাতৃ-মঙ্গল-সদনে (Maternity Home) পাঠান হয়, কিন্তু সেখানকার অবস্থা অতি শোচনীয়। অনেক সময়েই ঔষধপত্র, সাবান ইত্যাদি থাকে না এবং স্থানাভাব বশত ঃ একই ঘরে বহু প্রসব-কার্য সম্পন্ন করান হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার নারীদিগকে খুব কঠিন কঠিন কাজ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, পুরুষেরা যে বেতন পায়, তাহাতে তাহাদের ভরণ-পোষণ চলে না। তাই বাধ্য হইয়াই নারীদিগকেও কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। তা ছাড়া স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা করিবার বাতিকেও মেয়েদিগকে কাজ করিতে হয়, কারণ যে কাজ করিবে না, সেত খাইতে পাইবে না! নারীদিগের দ্বারা এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য করান যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জার কথা, সোভিয়েত রাশিয়ার সে অনুভূতি নাই। কয়লার খনিতে, ফ্যাক্টরীতে—সর্বত্রই নারী শ্রমিককে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার নারী-শ্রমিকের সংখ্যা অন্যান্য সকল দেশের অপেক্ষা বেশী। নিম্নের তালিকা দেখুন ঃ—

	সোভিয়েট ইউনিয়ন	জার্মানী	আমেরিকা	ফ্রান্স	ইংলণ্ড
খনিতে	২৭.৯	১	০˙৬	২˙৭	০˙৬
ধাতব					
কারখানায়	২৪˙৬	৬˙৫	৩	৩˙২	৫˙৪
ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭˙৪	১৭˙৪	৬˙৮	১২	১৭˙৫
গৃহনির্মাণ	১৯˙৮	২˙৯	১	১˙৫	১˙২

সোভিয়েট রাশিয়া ২০,০০০ শ্রমিক তরুণীকে সাইবেরিয়ার মরুভূমিতে বসতি স্থাপন কার্যের জন্য পাঠাইয়াছে। তাহাদের ভাগ্যে কী হইয়াছে কে জানে!

বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। মিলিটারী, পুলিশ, অমানুষিক জুলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোপ্যাগাণ্ডার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের খামখেয়াল অবাধে চলিতেছে ; কিন্তু এই গিল্টি-করা সাম্য ও সম্পদের তলে আছে কোটি মানুষের নীরব ক্রন্দন ও হাহাকার। বিখ্যাত লেখক লুই ফিশার (Louis Fischer) এই ভয়াবহ প্রাণহানি ও নরনির্যাতনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রশ্ন করিতেছেন ঃ

"Did the pros equal the cons? Did the promise equal the cost? —(Why I became Pro-Soviet p. 24)

অর্থাৎ ঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় যতটুকু ভাল করা হইয়াছে, তাহা কি মন্দটুকুর সমান? প্রতিশ্রুতি কি উহার মূল্যের সমান?

আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া এ-কথার জবাব দিন।

ইসলামিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌

আমরা মুখে বলি —ইসলামের কাছে কমিউনিজ্‌ম্‌ আদৌ নূতন নহে ; কমিউনিজমের মূল নীতির প্রায় সবগুলিই ইসলাম হইতে ধার করা। কিন্তু শুধু এই অলস আত্ম-প্রসাদ লইয়া বসিয়া থাকিলেই কমিউনিজ্‌ম্‌কে রুখা যাইবে না। কমিউনিজ্‌মের পশ্চাতে আছে অনেক যুক্তিতর্ক, দার্শনিক অস্ত্রশস্ত্র আর বহু বাস্তব প্রতিষ্ঠান। সে সকলের মোকাবেলা শুধু কোরান-হাদিসের আয়াত বা অতীতের দুই-একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নহে। কমিউনিজ্‌ম্‌কে পরাস্ত করিতে হইলে কার্যতও আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে। কাজীর গরু শুধু কেতাবে থাকিলেই চলিবে না, গোহালেও দেখাইতে হইবে। তাছাড়া বর্তমান জগতে এমন কতকগুলি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহাদের মোকাবেলায় ইসলাম কোন্‌ নূতন ব্যবস্থা দিতে পারে, তাহা সকলে আজ দেখিতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ঃ ইসলামে সুদ হারাম ; অথচ সুদকে এড়াইয়া বর্তমান জগতে কোন স্টেট বা কোন কারবার চলে না ; কেননা দেশে-বিদেশে ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই সমস্ত কাজ-কারবার করিতে হয় ; এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান মানিয়া চলিতে গেলে বর্তমান জগতে কি করিয়া চলা যায়, এ এক মস্ত সমস্যা। ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেই বা ইসলামের কী বলিবার আছে ? এসব প্রশ্ন অনেকের মনেই উঁকি মারে। ইসলামকে যদি সত্যি আমরা পূর্ণ ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে এই সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একটু চেষ্টা করিলেই এই সব সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি সমস্যা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত আমরা নিম্নে দিতেছি।

ইসলামিক স্টেট গঠিত হইলেই প্রথম সমস্যা আসিবে দেশের কাজ করিবার জন্য কি করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা যাইবে। বর্তমান জগতে প্রজাদের নিকট হইতে অথবা অন্যদেশ হইতে গভর্ণমেণ্ট সুদ দিয়া ঋণ (loan) গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলামে ত সুদ হারাম। কাজেই আমাদিগকে একটা নতুন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে নূতন ব্যবস্থা এইরূপে সম্ভব ঃ

মনে করুন দেশে যাতায়াতের জন্য রেল-লাইন, চটকল অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট সুদে টাকা ধার না লইয়া লভ্যাংশ বণ্টনের ভিত্তিতে প্রজাদের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে পারেন। তারপর প্রতি বৎসর সেই টাকার সুদ না দিয়া একটা নির্দিষ্ট হারে অগ্রিম লভ্যাংশ বিতরণ করিলেই হইল। গভর্ণমেণ্ট কাজে হাত দিলে রেললাইন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক, মিল বা যে কোন কার্যেই মুনাফা অনিবার্য। কারণ দেশের লোককে ঐসব জিনিস ব্যবহার করিতেই হইবে। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে লোকে আগ্রহ করিয়াই টাকা দিবে। একে ত লাভের অঙ্ক প্রচলিত সুদের হার অপেক্ষা বেশী হইবে, তার উপর গভর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিতে লোকের কোন আপত্তিও থাকিবে না। দশ বা বিশ বৎসরের মেয়াদে এরূপভাবে টাকা ধার লইলে অনায়াসে চলিতে পারে। ঐসব কারবার হইতে প্রতি বৎসর যে মুনাফা হইবে, তাহা হইতে কতকাংশ যাইবে সরকারী কর্মচারীদিগের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবদ, বাকিটা গভর্ণমেন্ট অন্যভাবে কাজে লাগাইবেন। দেনাগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে একটা লভ্যাংশ সহ এক সঙ্গে পরিশোধ করা যাইতে পারে। দশ বা বিশ বৎসর পরে দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া গেলে রেললাইন বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠান সমস্তই স্টেটের সম্পত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপে গভর্ণমেন্ট বিনা পয়সায় দেশের বড় বড় কাজ করিতে পারিবেন।

অথবা আর এক উপায়েও এসব কাজ করা যায়। গভর্ণমেণ্ট এ্যাসেমব্লিতে একটি আইন পাশ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট স্কীমের জন্য তিন কোটি বা প্রয়োজনানুরূপ টাকার নোট তাঁহারা ছাপিতে পারিবেন। সেই নোট ছাপিয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্কীম অনুযায়ী কার্য সমাধা করিবেন। এই অতিরিক্ত নোট ছাপিবার ফলে টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় সমাজে একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় (inflation) আসিতে পারে বটে, তাহাতে কিছু যায় আসে না; একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত নোটগুলি তুলিয়া লইলেই চলে। এরূপ ব্যাপার ত যুদ্ধের সময়ও ঘটিয়া থাকে। দেশের কাজেও কি ঘটিতে পারে না?

জাকাত প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও গভর্ণমেণ্ট অনেক বড় বড় কাজ করিতে পারেন। ধরুন জাকাতের জন্য স্বতন্ত্র একটি পোর্ট-ফোলিও খোলা হইল। একজন মন্ত্রী ইহার ভার লইলেন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশন্যাল হাকিম, সার্কেল অফিসার এবং সর্বনিম্ন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত কর্মচারীদের সিঁড়ি নামিয়া গেল। এখন যেমন ইউনিয়ন রেট ধার্য করিবার সময় গ্রামবাসীরা কাহার কত আয় হয় দেখিয়া হাড়ী ভাঙ্গিয়া দেয়, জাকাতের হাড়ীও সেইরূপ ভাবে ভাঙ্গা যায়। গ্রামবাসীরা একত্র মিলিয়া প্রত্যেক বৎসর কার কত জাকাত দিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। সার্কেল অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীরা তদন্ত করিয়া বোর্ডের সেই লিষ্ট অনুমোদন করিলে ইউনিয়ন রেটের সঙ্গে সঙ্গে জাকাতও স্বতন্ত্র রসিদে আদায় হইতে পারে। সেই অর্থের একাংশ সরকারী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ, এক অংশ কোরান-হাদিসের ব্যবস্থা অনুযায়ী দুঃস্থজনের সাহায্য ও অন্যান্য স্থানীয় অভাব-অভিযোগের পূরণ বাবদ এবং অবশিষ্ট অংশ সরকারী তহবিলে জমা হইতে পারে। জাকাত ফাণ্ড হইতে দেশের স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য বহু

সমাজ হিতকর কার্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিকে চালু করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। যে শাসনকাঠামো চালু আছে, প্রায় তাহাতেই হইয়া যায়।

লভ্যাংশ বিতরণের ভিত্তিতে ইসলামিক ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্সও খুব ভাল ভাবে চলিতে পারে। এক একটি পরিকল্পনা লইয়া দেশের শিল্প ও ব্যবসাও এই উপায়ে চালান যায়।

বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নহে। তা' ছাড়া আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞও নই। আমি শুধু দুই-একটি আভাস দিলাম মাত্র। এ বিষয়ে যাঁহারা আরো জানিতে চান, তাঁহারা "Economics of Islam" (by Shaikh Md. Ahmed) নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে পারেন।

কমিউনিজ্‌ম্‌কে ভয় করি না

কমিউনিজমের সাচ্চা চেহারা, দোষগুণ, ভালমন্দ—সব কিছুই আলোচনা করিয়াছি। ইসলামের সহিত ইহার সামঞ্জস্য ও পার্থক্য কোথায়, তাহাও দেখাইয়াছি। এখন কি আমরা জোর গলায় বলিতে পারি না যে, কমিউনিজমকে শেষকালে ইসলামিজমের কাছেই হার মানিতে হইবে?

কমিউনিজ্‌ম্‌ যদি সত্য সত্যই মানবকল্যানের জন্য আসিয়া থাকে, সত্যই সে যদি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব আনিতে চায়, সর্বহারাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে চায়, পুঁজিপতিদের অস্বাভাবিক ধনলিপ্সাকে খর্ব করিয়া জাতির অর্থসম্পদ ন্যায্যভাবে সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে চায়, এক কথায় মানবতাই যদি তার লক্ষ্য হয় তবে তার সঙ্গে কাহারও বিরোধ থাকার কথা নয়। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হইতে পারে! কিন্তু এই কাজ করিতে গিয়া সে যে অনাচার ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের আপত্তি। সে যদি সত্যই মানব-কল্যাণ চায়, তবে তাহার এই বর্বর সংহার মূর্তি ও যান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিভীষিকার ভিতর দিয়া, অরাজকতা, হত্যা, লুণ্ঠন, আইন-ভঙ্গ, নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দ্বেষ-হিংসার মধ্য দিয়া এবং সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন বিশ্বজনীন মানবকল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এ কাজের জন্য চাই প্রেম, সহানুভূতি, ত্যাগ ও সহযোগ। মানুষকে ভাল না বাসিয়া গুলী করিয়া, নির্বাসন দিয়া এত বড় সংস্কার আনা যায় না। মনীষী Bertrand Russel ঠিকই বলিয়াছেন ঃ—

"Hatred of enemies is easier and more intense than love of friends. But from men who are more

anxious to injure the opponent than to benefit the world at large no good is to be expected."

(The Practice and Theory of Bolshevism, p. 23)

অর্থাৎ ঃ মানুষকে প্রেম করা অপেক্ষা ঘৃণা করা সহজ। যারা শত্রুদিগকে আঘাত করিবার জন্যই ব্যস্ত, জগতের উপকার করিবার জন্য নয়, তাদের নিকট হইতে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না।

সত্যই ত! ধ্বংস, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও খুনখারাবি দ্বারা মানবপ্রেম হয় না। মানুষকে মারিয়া মানব সেবা? সমাজকে ধ্বংস করিয়া সমাজ-সংস্কার? কমিউনিজমের জন্য এক সোভিয়েট রাশিয়া-তেই ১৯২৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ লোককে কমিউনিষ্টরা হত্যা করিয়াছে। ("To sum up, one can reckon that a total of 10,00,000 people were slaughtered in the years from 1929 to 1939"—Stalin's Russia, p. 370) ইহা মাত্র দশ বৎসরের খতিয়ান। ১৯১৭ হইতে এ পর্যন্ত হিসাব ধরিলে অঙ্কটা যে আরো কতগুণ বাড়িয়া যাইবে, পাঠকই তাহা চিন্তা করুন। বস্তুতঃ এক ষ্ট্যালিনের আমলে এক বৎসরে যত অফিসার ও নেতৃ হত্যা হইয়াছে, একশত বৎসর ধরিয়া জার-শাসনেও তাহা হয় নাই। ("The fact is that by his massacre of his officials alone, Stalin outdid ten times—twenty times—within the space of one year—all the repression carried out by Czarism against all section of Russian Society during the course of almost a century"—Ibid, p. 373).

এই যদি কমিউনিজমের পরিচয় হয় এবং এই উপায়েই যদি কমিউনিষ্টরা 'নূতন জগৎ' (New World) গড়িতে চায়, তবে তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঠিকই

বলিয়াছেন, 'The Communists are greatest enemies of Communism." (অর্থাৎ : কমিউনিস্টরাই কমিউনিজমের প্রধান শত্রু।)

কমিউনিজমের পরাজয়ের দিন সত্যই ঘনাইয়া আসিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া যাহাই করিবে, তাহাই যে অভ্রান্ত ("Kremlin is infallible") এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরাও যে সোভিয়েট রাশিয়ার সব নির্দেশ মানিয়া চলিবে, এই উদ্ধত স্পর্ধা সংহত হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়াতে মার্শাল টিটো (Marshal Tito) আজ বিদ্রোহী। সোভিয়েট রাশিয়ার নির্দেশ অমান্য করিয়াই স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতেছেন ; কমিউনিস্ট নীতির অনেক কিছুই তিনি বর্জন করিয়াছে।

নয়া চীনও সোভিয়েট রাশিয়াকে একদম নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র চীনদেশ আজ কমিউনিজ্‌মের কবলে, কিন্তু হইলে কি হয়! চীনের কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়াই নিজ দেশে নূতন "গণতন্ত্রের" (New Democracy) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। চীনের কমিউনিজ্‌মের সহিত রাশিয়ার কমিউনিজমের তাই মূলতঃ কোন মিল নাই। চীনের কমিউনিজম শুধু এক-পার্টি শাসন (one party rule) নয়। চীনের কমিউনিজমের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক-প্রজার অধিকার ত স্বীকৃত হইয়াছেই, পুঁজিপতি ও জমিদারদিগেরও সেখানে স্থান আছে। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের মত চীনের কমিউনিস্টরা তথাকথিত বুর্জোয়া শ্রেণীকে একদম উচ্ছেদ করে নাই। দেশের সকল শক্তিকে মিলাইয়া ইহারা দেশ শাসন করিতেছে। ইহাই ত প্রকৃত সাম্য। চাঁদকে মারিয়া ফেলিয়া শুধু তারার রাজ্য কে চায়?

কমিউনিজম্‌ বাহিরে ক্যাপিট্যালিজ্‌মের ঘোর শত্রু হইলেও অন্তরে অন্তরে পাকা ক্যাপিট্যালিস্ট। সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যক্তিগত ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌ উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখন তার জায়গায় ষ্টেট

ক্যাপিট্যালিজম্‌ (State Capitalism) খুঁটা গাড়িয়া বসিয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্‌কে ভারতের ব্রাহ্মনিজ্‌ম্‌ (Brahmanism)-এর সহিতও তুলনা করা যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম যেমন অপর সকলকে ঘৃণা এবং শোষণ করিয়া সমাজের উপর নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে, কমিউনিজমও ঠিক তাহাই করিতেছে। ব্রাহ্মনিজ্‌মের বুনিয়াদ হইল অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism), আর কমিউনিজ্‌মের বুনিয়াদ হইল জড়বাদ (Materialism) ; এই যা পার্থক্য। অন্যথায় দুই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই।

জগতে শান্তি আনিতে হইলে এই দুই ইজ্‌ম্‌কেই ধ্বংস করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, দুই-এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম শুরু হইয়াছে।

বস্তুতঃ কমিউনিজম বা ক্যাপিট্যালিজম—কেহই জগতে শান্তি আনিতে পারিবে না। শান্তি আনিবে ইসলামিজ্‌ম্‌। বিরুদ্ধ দুই-প্রান্তিক দুইটি শক্তিকে সে-ই হাত ধরিয়া মিলাইয়া দিবে। এইরূপে Thesis, Antihtesis এক বিরাট Synthesis-এর মধ্যে আসিয়া শান্ত হইবে। এই জন্যই ত ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম।

আজ জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইলে দেখা যায় : তিনটি শক্তি যেন সেমি-ফাইনালে (Semi-final) উঠিয়া ফাইনালের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। একদিকে Anglo-Saxon Block অন্য দিকে Soviet Russian Blok—ঠিক উভয়ের মাঝখানে (মধ্য-প্রাচ্যে) আর একটি শক্তিও সকলের অলক্ষ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেটি হইতেছে Islamic Block. Anglo Saxon Block হইতেছে ক্যাপিটালিস্টিক (ইংলণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি), Soviet Russian Block হইতেছে কমিউনিস্টিক (সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশসমূহ), আর Islamic Block (আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিসর, আফগানিস্তান, তুর্কীস্তান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) হইতেছে ক্যাপিটো-কমিউনিস্টিক, অর্থাৎ উভয়ের

মধ্যবর্তী। ইসলামের ভাষায় ইহাই হইল সিরাতল- মুস্তাকিম্‌ বা সরল পথ। কমিউনিজ্‌ম্‌ ও ক্যাপিটালিজম উভয়েই আজ যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত ; তাহারা নিজেরাও আজ ঘায়েল হইয়াছে, পৃথিবীকেও ঘায়েল করিয়াছে, কিন্তু কেহই জগতে শান্তি আনিতে পারে নাই, বরং সারা পৃথিবীতে তাহারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। কে এই আগুন নিভাইবে? ইসলাম। জগতের শেষ যুদ্ধ তাই এই ত্রি-শক্তির মধ্যে ঘটিবে। ফলে ইসলাম জয়যুক্ত হইবে, কমিউনিজ্‌ম্‌ ও কাপিট্যালিজমকে পরাজিত করিয়া সে উভয়কেই আপন বুকে স্থান দিবে। ইসলামের শান্ত-শীতল ছায়াতলে আসিয়া ও কমিউনিজ্‌ম্‌ ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌ এক চরম ঐক্যের মধ্যে মিলাইয়া যাইবে।

কিন্তু ইসলাম সহজেই এই চরম বিজয় আশা করিতে পারে না। তার দুই দিকে দুই প্রবল শত্রু। কাজেই ইসলামকেও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। ইসলামিক ব্লকে যে সমস্ত বিভাগ (Unit) আছে, সবগুলিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। আরব ইউনিট, আফ্রিকান ইউনিট, ককেশিয়ান ইউনিট, সেন্ট্রাল এশিয়ান ইউনিট, ইন্দোনেশিয়ান ইউনিট, পাকিস্তান, আফগানিস্তান—অন্য কথায় : সমস্ত ইসলামিক ষ্টেটগুলির মধ্যেই সংহতি আনিতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ এক হইবে। এইরূপে এক বিরাট ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই ঐক্য-সাধনা ও আজাদীর সংগ্রামে পাকিস্তানকেই নেতৃত্ব করিতে হইবে, কারণ পাকিস্তানই হইতেছে মুসলিম জাহানের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। এই গুরু-দায়িত্বের কথা পাকিস্তানকে ভুলিলে চলিবে না। আজ বিভিন্ন ইসলামিক ষ্টেটগুলির সহিত পাকিস্তান কেন তামদ্দুনিক সম্বন্ধ (Cultural relation) স্থাপন করিতে চাহিতেছে এবং কেনই বা আরবী হরফে বাংলা লেখার পরিকল্পনা

এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তাহার গূঢ় কারণ অনেকটা এইখানে মিলিবে।

এক নূতন ঐতিহাসিক ভূমিকায় ইসলাম এবার অভিনয় করিবে। ইসলাম আনিবে নূতন বিধান, কৃত্রিম গণতন্ত্রও (democracy) নয়, স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটরশিপও (dictatorship) নয় ; সার্বভৌমিক সাম্রাজ্যবাদও (Imperialism) নয়—ইসলামের রাষ্ট্র-আদর্শ স্বতন্ত্র। গণতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ বা ডিক্টেটরশিপ—কোন একটিকেও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামিক রাষ্ট্র শাসিত হইবে আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ দ্বারা। এই হুকুমাতের আসন (seat of Government) একজনের উপরেও ন্যস্ত থাকিতে পারে, বহুর উপরেও থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে এই আদর্শ ও বিধান হইতে বিচ্যুত হইলে কোন শাসনতন্ত্রকেই ইসলাম সমর্থন করে না। গণতন্ত্র হইলেই ভাল হয় না ; সাম্রাজ্যবাদ হইলেই খারাপ হয় না। যে-গণতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ নাই, ইসলামের নিকটে তাহা অগ্রাহ্য। ইসলামের বিধান শাশ্বত ও সনাতন, সে বিধান একজনের মধ্য দিয়াই আসুক, অথবা বহুর মধ্য দিয়াই আসুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। সে বিধান প্রজাও যেমন মানিবে, রাজাকেও ঠিক তেমনি মানিতে হইবে। কোন একটি বিশেষ কাঠামোর প্রতি তাই ইসলামের পক্ষপাতিত্ব নাই। আল্লামা ইউসুফ আলী এ সম্বন্ধে ঠিক বলিয়াছেন :

"The religious polity of Islam is not committed to any particular form of sovereignty, such as kingship, autocracy or domocracy. It defines certain great principles and lays down certain conditions for a righetous state.—The supremacy of law is one of the fundamental tenents of Islamic polity.

It is supreme not only over the subjects but over the subjects but over their rulers as well."

(Quoted from Dr. Zaki Ali's "Islam in the World." p. 50)

মার্কস ধর্মকে বলিয়াছেন 'আফিম"। সে কথা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে খাটে না, কারণ ইসলামের আছে জেহাদের অগ্নিমন্ত্র। ইসলামের কোনখানে কোন অভাব নাই।

'ইসলাম'—এই শব্দটির মধ্যে উহার আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছে। সব 'ইজ্‌ম্‌'-এরই উহা মিলন ক্ষেত্র। ISLAM শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষরের এইরূপ অর্থ করা যায় ঃ

I—Imperialism.
S—Socialism.
L—Liberalism.
A—Allahism.
M—Materialism.

সব 'ইজ্‌ম' লইয়াই তাই 'ইসলামিজম' গঠিত। সেই ইসলামই আমাদের ধর্ম, আমরা কেন তবে কমিউনিজ্‌ম্‌কে দেখিয়া ভয় পাইব ?

ইসলামের লাল-মশাল আজ দিকে দিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অনাগত যুগের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। দিগদিগন্তে নবপ্রভাতের ইঙ্গিত ধ্বনিত হইতেছে। সেই নূতন প্রভাতকে আজ অভিনন্দিত করি।——

পরিশিষ্ট

'ইসলাম ও কমিউনিজ্‌ম্‌' বাহির হইবার পর প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভারত ও সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া' পুস্তকে আমার পুস্তক হইতে বহুস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমালোচকের বক্র দৃষ্টিতেই তিনি আমার reference দিয়াছেন। ইসলামের আলোকে আমি যে কমিউনিজ্‌মের দোষগুণ আলোচনা করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই—লেখক এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সব তথ্য দিয়াছি ও মন্তব্য করিয়াছি, তার একটিরও তিনি জবাব দিতে পারেন নাই। তাঁর সমালোচনার নমুনা দেখুন ঃ

"উক্ত 'ইসলাম ও কমিউনিজ্‌ম্‌' গ্রন্থে গ্রন্থকার গোলাম মোস্তফা সাহেব 'ইসলামের সহিত কমিউনিজ্‌মের পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়ে যে-ভাবে কোরান শরীফের উদ্ধৃতির সাহায্যে পুঁজিবাদের প্রয়োজন, ধনী-নির্ধনের, আমীর-গরীবের ভেদাভেদ ও মানুষের দুঃখ-কষ্টের স্বাভাবিকতার প্রতি ইসলাম ধর্মের সমর্থন রয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে মনে হয়, তাঁর ব্যাখ্যা ও যুক্তি দুই-ই পরিপূর্ণ নয় এবং আংশিক ও অসম্পূর্ণ বলে বিকৃত। স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডাকারে কোরান শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করে আল্লাহর বাণীর মর্ম প্রচার করা বোধ হয় সম্ভব নয়।"—(ভারত ও সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া, ৫৫ পৃষ্ঠা।)

এই নমুনা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন লেখকের যুক্তি কত দুর্বল ও অগভীর। পবিত্র কোরান, হাদিস হইতে আমি যেসব বাণী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে কোন হেঁয়ালি বা অস্পষ্টতা নাই। ইসলামের যাহা বিধান, তাহাই বলা হইয়াছে। তবু লেখক মহোদয় সেগুলিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি সেগুলির বিকৃত অর্থ করিয়াছি। বিকৃতির অভিযোগ বরং

তাঁর বিরুদ্ধেই আনা যায়। তিনি তাঁর পুস্তকে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিকৃত ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

"আমানুল্লাহ হলেন ইসলামদ্রোহী কাফের আর বাচ্চাই সাক্কা হল আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল!"—(৪৩ পৃষ্ঠা)

"ইসলাম প্রচারকেরা) ইসলামের মহান আদর্শকে মানুষের অন্তরের মনিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। উদ্যত বর্শা ও বল্লম ইসলামের জয় ঘোষণা করেছে।"—(৫০ পৃষ্ঠা)

"মন্দিরের বদলে মসজিদ, বৌদ্ধ বিহারের বদলে মাদ্রাসা গড়ে উঠল মধ্য এশিয়ায়।"—(৫১ পৃষ্ঠা)

"মৌলবী বা মোল্লার সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহর কোন পার্থক্যই নেই তাদের কাছে। তারা জানে মোল্লা বিদ্বান, মৌলবী পণ্ডিত, কোরান তাদের কণ্ঠস্থ, আল্লাহর প্রিয়পুত্র তারা!"—(৫৬ পৃষ্ঠা)

"এই সাম্য? বিসমিল্লা! বিসমিল্লা!"—(৮৪ পৃষ্ঠা)

"আমীরের রাজপ্রাসাদ আর কাবার মসজিদ তার কাছে এক, কারণ মোল্লা বলেছেন।"—(৮৬ পৃষ্ঠা)

"কেতাবী সত্যকে তারা বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে মাটির সত্যকে।"—(১৬৭ পৃষ্ঠা)

"মোল্লার বীভৎস আর্তনাদ নির্জন মরুভূমির বুকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শূন্যে। জয় হল ট্রাক্টরের!"—(১৬৭ পৃষ্ঠা)

"মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের আজান যেমন শোনা যায়, তেমনি শত শত কলকারখানা থেকে হাজার হাজার যন্ত্রের সমবেত কণ্ঠের আজান (!) আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে!"—(১৯৪ পৃষ্ঠা)

এই ধরনের বহু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে পুস্তকখানি ভরপুর। ইসলাম ধর্ম যে কিছু না, কাজাক, কিরগিজ, উজবেক প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র-গুলি যে ইসলামী অনুশাসনে এতকাল বর্বরতার অন্ধকারে ছিল,

কমিউনিজমই যে তাহাদের দেশে ভূ-স্বর্গ আনিয়া দিয়াছে, মুয়াজ্জিনের আজানকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া "যন্ত্রের আজানে"ই যে মুসলমানেরা এখন জাগিয়া উঠে—এই সব কথাই তিনি প্রচার করিয়াছেন।

এই সব অসংযত উক্তির মূলে কোন সত্য না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমানদের রক্ত-মাংসে জড়ান আছে আল্লাহ্‌ ও রসুলের প্রেম। সোভিয়েট রাশিয়ায় বাস করিলেও মুসলমানেরা আল্লাহ্‌-রসুল, কোরান-হাদিস, নামাজ-রোজা ইত্যাদিকে ভুলে নাই—তা' লেখক যত ফলাও করিয়াই কমিউনিজমের মহিমা কীর্তন করুন না! আর যদি লেখকের কথা সত্যই হয় তবে কমিউনিজম সম্বন্ধে মুসলমানদের ঘৃণা আরও গভীর হইবে। যে কমিউনিজম মুসলমানের মন হইতে তার আল্লাহ-রসুল, নামাজ-রোজা ও কোরান-হাদিসের কথা মুছিয়া দেয়, কেতাবী সত্যকে ভুলাইয়া দিয়া "মাটির সত্যকে" বড় করিয়া তোলে, তাহাকে শত ধিক্কার।

বস্তুতঃ কমিউনিজমের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া প্রচারকেরা এত কুৎসিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে যে, ভাবিলে সত্যই দুঃখ হয়। মুসলমানদিগের উচিত ঃ কমিউনিজম সম্বন্ধে আজে-বাজে বই পড়িয়া তাঁহারা যেন বিভ্রান্ত না হন। কমিউনিজম অপেক্ষা বড় জিনিস তাঁহাদের হাতে আছে। মণি ফেলিয়া তাঁহারা যেন কাচ কুড়াইয়া না লন।

—

প্রমাণপঞ্জী

'ইসলাম ও কমিউনিজ্‌ম্‌' লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে ঃ

১। Capital—by Karl Marx
২। Dialectical Materialism—by Marx & Engels
৩। Historical Materialism—by Marx & Engels
৪। Programme of the Communist International
৫। Life & Teaching of the Karl Marx —by Engels, Lenin & Stalin
৬। The Penguin Political Dictionary
৭। Marxism : Is it Science ?—by Max Eastman
৮। Manifesto of the Communist Party —by Marx & Engels
৯। Pan-Islamism and Bolshevism - by M. H. Kidwai
১০। Soviet Strength—by Hewlett Johnson
১১। A Text-book of Marxist Philosophy
১২। Soviet Russia—by Sidney & B. Webb
১৩। The Dawn over Samarkand—by Kunitz
১৪। Socialism in Evolution—by G. D. H. Cole
১৫। Marxism & the Question of Nationalities —by J. Stalin
১৬। What is marxism ?—by M. N. Roy
১৭। Socialism : Utopian and Scientific— by Engels

১৮। The Intelligent Woman's Guide to Socialism etc.—by Bernard Shaw
১৯। পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য—by G. Adhikary
২০। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস
২১। Communism—by prof. Laski
২২। U. S. S. R.—by Sen & Reip.
২৩। Socialism Reconsidered—by M. R. Masani
২৪। Economics of Islam—by S. M. Ahmad
২৫। Public Finance of Islam—S. A. Siddiqi
২৬। Why I became Pro-Soviet—by Louis Fisher
২৭। ভারত ও সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া—by বিনয় ঘোষ
২৮। Islam and Socialism —by Mirza Muhammad Hossain
২৯। Mother Russia—by Maurice Hindus
৩০। Stalin's Russia—by S. Labin
৩১। The Practice and Theory of Bolshevism —by Bertrand Russell
৩২। Islam in the World—by Dr. Zaki Ali